মাশান রহস্য



সৌমনা দাশগুপ্ত

মাশান রহস্য

সৌমনা দাশগুপ্ত



একটি সৃষ্টিসুখ প্রয়াস
www.sristisukh.com

Mashaan Rahasya

A novel by Soumana Dasgupta

ISBN 978-81-944643-4-1

প্রথম সংস্করণ - জানুয়ারি, ২০২০

সৃষ্টিসুখ প্রকাশন এলএলপি-র পক্ষে হাল্যান, বাগনান, হাওড়া ৭১১৩১২ থেকে রোহণ কুদ্দুস কর্তৃক প্রকাশিত

প্রচ্ছদ - পার্থপ্রতিম দাস

মূল্য - ১৬০ টাকা (ভারতীয় মুদ্রা) / ১৩.৯৯ আমেরিকান ডলার
ই-বুক সংস্করণের মূল্য - ৯০ টাকা (ভারতীয় মুদ্রা)

ই-বুক সংস্করণ - দ্য বুকমেকার্স
(thebookmakers2020@gmail.com)

মুদ্রক - সৃষ্টিসুখ প্রিন্ট (www.sristisukhprint.com)

সৃষ্টিসুখ-এর বইয়ের আউটলেট - ৩০এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
যোগাযোগ - ৭৮২৯৭ ৪১৭৯৭, ৯০৫১২ ০০৪৩৭

বিশেষ কৃতজ্ঞতা : মেহদী হাসান খান, ওমিক্রন ল্যাব ও অভ্র কিবোর্ড ডেভালোপমেন্ট টিম।

বিমলেন্দু মজুমদার

ভূমিকা

আমার ছোটোবেলা থেকে শুরু করে জীবনের বেশিটা সময়ই কেটেছে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায়। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এই জেলা যেমন প্রকৃতির অকৃপণ দানে ঐশ্বর্যময়ী, তেমনই বিভিন্ন জাতি-জনজাতির লৌকিক সংস্কৃতির উপাদানে ঐতিহ্যমণ্ডিত এখানকার কৃষ্টি। অনেক ছোটো থেকেই বাবার সঙ্গে ঘুরতে যাওয়া আমার প্রায় প্রতিটি ছুটির দিনের অভ্যেস ছিল। বাবার সাইকেলের সামনে আমার জন্য একখানা ছোট্ট সিট লাগানো ছিল, আর সেই সাইকেল ছিল আমাদের পক্ষিরাজ ঘোড়া। আজও মনে পড়ে ছুটির দুপুরে আমাদের ছোট্ট শহর যখন ভাতঘুমে আয়েশ করত, বাবা আর আমি কত কত গ্রামে-গঞ্জে, কত চা-বাগানে, কত জানা অজানা নদী বা ঝোরার ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কখনও গ্রামের হাট থেকে তাজা সবজি বা মাছ কিনে বাড়ি ফিরছি, আবার হাটের লোকজনের সঙ্গে গল্পে মশগুল হয়ে গেছেন বাবা, আর আমি হাঁ করে বসে সেইসব গল্পকথা শুনছি। এই হাটগুলো হল নৃ-সাংস্কৃতির এক মিলনক্ষেত্র। উত্তরবঙ্গের জাতি জনজাতির পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কৃতির এক জীবন্ত ছবি। এরকমই ঘুরতে ঘুরতে কোনোদিন হয়তো বাবার পরিচিত গ্রামের কোনও মানুষের বাড়িতে বসে দুপুরের ভাত খেয়েছি, তাঁদের ছেলেপুলেদের সঙ্গে নদীতে নেমে স্নান করেছি, গামছা দিয়ে কুচোমাছ ধরেছি। তখন তো বিনোদন বলতে ছিল এইরকম ঘোরাঘুরিগুলোই। এভাবেই ধীরে ধীরে বিভিন্ন গ্রামদেবতার থান ও

গ্রামের মানুষ-জনের জীবনযাত্রার সঙ্গে আমার পরিচয় হতে থাকে। বড় হয়ে যাওয়ার পরও সেই ঘুরে বেড়ানোর অভ্যেস আমাকে ছেড়ে যায়নি। এরকমই একদিন শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে রাজগঞ্জ বাজারে গিয়ে দেখি এক শোলাশিল্পী তাঁর পসরা সাজিয়ে বসেছেন। তাঁর কাছেই আমি প্রথম মাশানদেবতার শোলার মূর্তি দেখি। উজ্জ্বল রং এবং আকৃতির জন্য প্রথম দেখাতেই এই লোকদেবতার মূর্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। আগ্রহ জন্মায় এই পরম্পরা সম্পর্কে। শুরু করি পড়াশোনা, সেই সঙ্গে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে সেখানকার মানুষজন ও মাশানশিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকি। সংগ্রহ করি বিভিন্ন মাশানদেবতার মূর্তি ও ছবি। এই কাজ করতে গিয়ে বুঝতে পারি উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের এক সুপ্রাচীন লোকদেবতা মাশান। যুগে যুগে ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণকামনায় মানুষ মাশানদেবতার পুজো করে এসেছে। কিন্তু সেসময় এই বিষয়ে নোট নেওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু লিখে ওঠা হয়নি। তবে মনের মধ্যে সেই ইচ্ছেটা রয়েই গিয়েছিল। অবশেষে যখন 'বম্বে-ডাক' পত্রিকার সম্পাদক অর্ঘ্য দত্ত ওঁর পত্রিকার জন্য উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির ওপর একটি প্রবন্ধ চাইলেন, সেই প্রথম আমি এই লোকদেবতার ওপর একটি দীর্ঘ গদ্য লিখি, যা আমার অজান্তেই আমার ভেতরে এই উপন্যাসের বীজ বপণ করে দিয়েছিল।

এই বই প্রকাশের জন্য আমি কৃতজ্ঞ সৃষ্টিসুখ প্রকাশন-এর দুই কাণ্ডারী সরোজ দরবার ও রোহণ কুদ্দুসের কাছে, যাঁদের উৎসাহ ছাড়া বই আকারে উপন্যাসটি প্রকাশের সাহসই আমি পেতাম না। কথায় আছে, মায়ের ঋণ শোধ করা যায় না। তাই ভালোবাসা জানাই আমার জন্মস্থান জলপাইগুড়ির মাটিকে, যেখানে না জন্মালে এই লেখা আমি কোনোদিনই লিখতে পারতাম না। প্রণাম জানাই

আমার বাবাকে, যাঁর ছায়ায় বড়ো হয়ে না উঠলে আমার চিন্তাভাবনার কোনও দিশা তৈরি হত না।

সৌমনা দাশগুপ্ত

সূচিভেদ্য অন্ধকার কথাটা এতদিন কেবল বইয়ের পাতায় পড়েছিল, এখন অর্থটা মালুম হচ্ছে হাড়েহাড়ে! দিন-রাত্তির বছর-মাস সবকিছুর হিসেব গুলিয়ে যাচ্ছে। তার ওপর কী ঠান্ডা, বাপ রে! যেন একটা ভিজে কম্বল গায়ে জড়িয়ে দিয়ে কেউ খুব জোরে এসি চালিয়ে দিয়েছে। এসি বললেও ভুল হবে, এসি-র হাওয়ার সঙ্গে কোনও তুলনাই হয় না এই ঠান্ডার। একেবারে হাড়-মাংস-মজ্জা ভেদ করে ঢুকে যাচ্ছে। শরীরে কোনও সাড় নেই, পুরো জমে পাথর। কীরকম একটা আচ্ছন্নতা, একটা ঘোর ঘোর ভাব।

ও প্রাণপণে চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু গলা দিয়ে কোনও আওয়াজই বেরোয় না। ও কি আদৌ বেঁচে আছে! ভাবতেই বরফগোলা জলের মতো একটা ভয় মাথা থেকে পা অব্দি ছড়িয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি করে উঠে বসতে গিয়েই বুঝতে পারল, সমস্ত শরীরটাই লোহার মতো ভারী হয়ে আছে। শুধু ঘুম পাচ্ছে। চোখের পাতায় কেউ যেন গাঢ় কোনও আঠা লাগিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ করে অন্ধকারের ভেতর বাদুড়ের ডানা ঝাপটানোর মতন এক ঝটকায় দরজাটা খুলে যায়। তীব্র আলোর ছটায় ভেসে যাচ্ছে গোটা ঘর। যেন একটা আলোকপিণ্ড ঝাঁ করে ঢুকে পড়ল এই ঘরে। না না আলোকপিণ্ড নয়, একটা মানুষ, তার মুখ নেই, লাল কালো ডোরাকাটা মুখোশ, সেই মানুষ অশ্বারূঢ়, হাতে কৃপাণ। সাঁই সাঁই শব্দে বাতাস কাটতে কাটতে এগিয়ে আসছে ওর দিকে, ওকে পালাতে হবে, পালাতেই হবে।

বাইরে একদল শেয়াল ডেকে উঠল। শব্দের আচমকা ধাক্কায় ঘোর কেটে যায়। নিজের ওপর হারিয়ে ফেলা কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। বুঝতে পারে যতই পরিকল্পনা-মাফিক এগোতে চাক না কেন, সবকিছু মানুষের নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে

না। ভবিতব্যকে এড়িয়ে যাওয়া কি অতই সহজ! আগুপিছু না ভেবে, ও শুধু বোকার মতো স্বপ্ন দেখে গেছে। স্বপ্ন তো স্বপ্ন-ই। তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গেলে যেসব অনুঘটক প্রয়োজন সেগুলো কি আর সবার কপালে জোটে! ...

১

সকাল আটটা। পূর্ব সিকিমের ছোট, নিস্তরঙ্গ গ্রাম মানখিমে দিনের কাজকর্ম শুরু হয়ে গেছে। গ্রামের মেয়ে বউরা কেউ কেউ ধাপ-চাষের খেত থেকে আলু বা আদা তুলে টুকরিতে জমা করছে, কেউ বা তাদের এক টুকরো ভুট্টার জমিনে মাটি নিড়িয়ে দিচ্ছে। দোকানপাটগুলোও একে একে খুলতে শুরু করেছে। দোকান বলতে আমরা, শহরের মানুষেরা যেমন বুঝি, তেমন কিছু নয়। বাড়ির সামনের ঘরটাতেই বা ঘরের সামনে বেঞ্চ পেতে চা, টোস্ট বা খুব বেশি হলে মোমো থুকপা বিক্রির ব্যবস্থা। মেরেকেটে হাজার দেড় হাজার জনসংখ্যার এই গ্রামে মুদিখানা তথা মনোহারি দোকান একটাই। মালকিন পেমা দরজি দোকান চালাতে চালাতেই দিব্যি সংসারের কাজকর্ম, দুটো বাচ্চা মানুষ করা সবকিছুই একা হাতে সামলে নেয়। হোমস্টেগুলোর মালিক বা তার পরিবারের লোকজনদের এই সময় দম ফেলার ফুরসৎ নেই। ট্যুরিস্টদের চেক-ইন বা চেক-আউটের সময়। তারপর আছে ব্রেকফাস্টের তাল। আগে উৎসবের মরশুম ছাড়া এত ভিড় হত না। এখন রাস্তাঘাট ভালো হয়ে যাওয়ায় সারা বছরই ট্যুরিস্ট আসতে থাকে। আজ একটা বড়ো দল এসেছে। রবিন রাইয়ের মনটা তাই বেশ খুশি খুশি। হোমস্টে-র ব্যবসায় আজকাল কম্পিটিশন খুব বেড়ে গেছে। রবিন আগে থেকেই ঘরগুলো রেডি করে রেখেছিল। খদ্দেরই হল আসল লক্ষ্মী, ওরা খুশি থাকলেই ব্যবসা তরতর করে চলবে।

রবিন হাঁক পেড়ে ওর ভাইকে ডাকে, ও কিসনা, ইয়ো লাগেজহারু ছিটো ছিটো ঘরমা লাই জাও। ট্যুরিস্টের দল হইহই করতে করতে ঘরে ঢুকছে। ওদের মধ্যে আবার একটা মেয়ে রবিনের বাড়ির মাচায় স্কোয়াশের লতানো গাছ দেখে অবাক হয়ে ওর মাকে ডেকে দেখাচ্ছে, পাশে দাঁড়িয়ে ঝপ করে একখানা সেলফিও তুলে ফেলল। ঘরে গিয়েই স্টেটাস দিতে হবে না! ফেসবুকে পোস্ট করে দিলেই কমসে কম একশখানা লাইক। ওর বন্ধুরা কি আর এমন গাছ দেখেছে কখনও! রবিনের পাঁচবছরের ছেলেটা এতক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইসব শহুরে লোকেদের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। সেও এবার হেসে ফেলে।

ঠিক এরকম সময়েই গ্রামের একমাত্র পাকা সড়কের উৎরাই বেয়ে পেমার বড়ো ছেলেটা চিৎকার করতে করতে নেমে আসে, খুন! খুন! দেবলামাকো রাতি কোসাইলে মার্ডার গরে দিয়ো ছ।

পুরো ব্যাপারটা সকলের মগজে ঢুকতে ঢুকতেই বেশ কিছুটা সময় পার হয়ে যায়। তারপরই পিলপিল করে লোক ছুটতে থাকে গ্রামের মনাস্ট্রির দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মনাস্ট্রির সামনের চাতাল লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠল। কাউকেই ভেতরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে আটকে রেখেছে। বাইরের জনতার মধ্যে শোরগোলের একটা তরঙ্গ উঠেই আবার মিলিয়ে যায়। একটা লালবাতি লাগানো এসইউভি গাড়ি এসে দাঁড়ায়। ভেতর থেকে লাফিয়ে নামল পূর্ব সিকিম জেলার এস পি তমাল রায়। গোটা সিকিমের ইতিহাসে এই প্রথম একটা মঠের মধ্যে আচার্য খুন। প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনা। এজন্যই কোনও সাধারণ অফিসারকে দিয়ে তদন্ত না করিয়ে একজন আইপিএসকে নিয়োগ করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। তমাল রায় বেশিদিন হল এই পোস্টে জয়েন করেনি, কিন্তু এর মধ্যেই ড্রাগ পাচারের একটা চক্রকে হাতেনাতে ধরে ফেলে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। লম্বায় প্রায় ছ-ফিট, নিয়মিত জিম করা সুঠাম শরীর,

বুদ্ধিদীপ্ত চোখ আর ধারালো কথাবার্তা, সব মিলিয়ে সিকিমের পুলিশ-বিভাগে তমাল রায় এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ নাম। থানার দারোগা গুরুং আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

স্যার এই ঘরেই বডি পাওয়া গেছে। দেখুন স্যার, বডিতে কিন্তু শার্প ইন্সট্রুমেন্টের কোনও ইনজুরি নেই, ইনফ্যাক্ট ইনজুরির কোনও চিহ্নই নেই, গুরুং লামার শরীরের দিকে দেখিয়ে বলে।

কিন্তু, মিস্টার গুরুং, বডির হাত-পায়ের আঙুলে সায়ানোসিস হয়ে গেছে, মাইনিউটলি দেখুন, কালার চেঞ্জ করে গেছে। মুখটা নোটিস করুন, স্পেশালি চোখগুলো দেখে যা মনে হচ্ছে... তা ছাড়াও রাইগার মর্টিস সেট ইন করেছে। তার মানে অনেক আগেই এই মার্ডার হয়েছে, মোস্ট প্রবাবলি রাতের আর্লি আওয়ারেই।

ওই ছোট্ট ঘরটার ভেতর এক রাতের মধ্যে যেন ঝড় বয়ে গেছে। বিছানা বালিশ কাপড় জামা বাক্স প্যাঁটরা সব কিছু ওলট-পালট হয়ে পড়ে আছে। মেঝের ওপর বৃদ্ধ লামার মৃতদেহ, চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, যেন ভয়ানক আতঙ্কে শিউরে ওঠা এক মানুষের মুখচ্ছবি। তমাল লাশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দিয়ে গ্যাংটককে ফোন করল,

এই কেসের জন্য স্পেশাল ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্টের লোক চাই, আর স্নিফার ডগও পাঠাতে হবে। অ্যাপারেন্টলি কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবে যেহেতু এইসব মঠে সোনাদানা, পুরোনো মূর্তি, এসব দামি জিনিসপত্র রাখা থাকে, তাই সাসপেক্ট করা যায়, কোনও মূল্যবান জিনিসের জন্যই এই মার্ডার। ভিক্টিমের সঙ্গে কারোর ব্যক্তিগত শত্রুতা থাকার কোনও কারণ নেই, যেহেতু ভিক্টিম একজন মঠের অধ্যক্ষ।

স্যার, প্রেসের লোকেদের কিন্তু অনেকক্ষণ ভুজুংভাজুং দিয়ে আটকে রেখেছি। এবার বেরোলেই ওরা ছেঁকে ধরবে, সবগুলো এক একটা ফেভিকলের

টিউব, একবার পিছনে লাগলে আর ছাড়তে চায় না, গুরুংএর মুখে অস্বস্তির ছাপ।

একদম বুঝেসুঝে কথা বলবেন মিস্টার গুরুং। প্রেসের স্বভাবই হল, তিলকে তাল করা। একটু এদিক ওদিক হলেই কিন্তু পাবলিকের মধ্যে অ্যাজিটেশন তৈরি হতে থাকবে। খুব আর্জেন্ট না হলে আমি প্রেসকে মিট করব না। আপনি এদিকটা সামাল দিন। সবসময় একটা কথা মাথায় রাখবেন, বেফাঁস কিছু যেন মুখ দিয়ে না বেরিয়ে যায়। ওরা কিন্তু নানাভাবে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, আপনি একদম রিয়্যাক্ট করবেন না, শুধু বলবেন, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট না পাওয়া অব্দি কিছুই বলা যাচ্ছে না।

ও আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব, আপনি চিন্তা করবেন না স্যার, মাথার চুল পাকিয়ে ফেললাম এই পুলিশে চাকরি করতে করতে, গুরুং টুপিটা ঠিক করতে করতে তমালের দিকে তাকায়।

মিস্টার গুরুং এবার মঠের লোকজনদের একে একে ডেকে পাঠান। সবার স্টেটমেন্ট নিতে হবে, তমাল বলে।

বাইরে জড়ো হওয়া মানুষজনের মনোভাব আঁচ করে নেওয়ার জন্য গেটের দিকে তাকাতে হঠাৎ করেই তমালের নজরে পড়ে, একজন যুবক প্রাণপণে ভিড় ঠেলে ভেতরে আসার চেষ্টা করছে। আর পুলিশ এই মুহূর্তে কাউকেই মনাস্ট্রির ভেতরে যেতে দিচ্ছে না। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা, ঢুকবেই। ওর উদভ্রান্ত চেহারা দেখে বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক তমাল ওকে ডেকে পাঠাল— বলুন, কী বলতে চান।

স্যার ভীষণ বিপদ, সে প্রায় রেলগাড়ি চালানোর মতো তড়বড়িয়ে বলতে থাকে, আমি আর কলকাতার একজন পেইন্টার ভদ্রমহিলা এই লামার কাছে এসেছিলাম দুষ্প্রাপ্য কিছু পটের ব্যাপারে তথ্যের জন্য। আমরা এখানেই একটা হোমস্টেতে গত এক সপ্তাহ ধরে ছিলাম। কিন্তু কাল রাত থেকেই আর্টিস্ট ম্যাডামকে আর খুঁজে পাচ্ছি না; যুবকের গলার স্বর

উত্তেজিত, সন্ধেবেলাতেও আমরা একসঙ্গে বসে চা খেলাম, তারপর আটটা সাড়ে-আটটা নাগাদ রাতের খাবার খাওয়ার সময় ওঁকে ডাকতে গিয়ে দেখি, ঘর তালাবন্ধ। তখনই আমরা আশেপাশে সব জায়গায় খুঁজে দেখি। কিন্তু, নেই তো নেই-ই। সারাটা রাত যে কীভাবে কাটিয়েছি, সে কেবল আমিই জানি। ভোর হতে না হতেই থানায় ছুটে গেছি। মিসিং ডায়েরি করার পর মনে হল, একবার মনাস্ট্রিতে গিয়ে খোঁজ নিই, কিন্তু, এখানে এসে দেখি, আবার এই কাণ্ড। আমার খুব ভয় করছে স্যার।

ব্যস, কেস সলভড, গুরুং বলে। ওই মেয়েছেলেটাই লামাকে বিষ খাইয়ে ছবি নিয়ে ভেগেছে। লামার ঘরে তো কোনও পট-ফট কিছুর টিকিটিও দেখলাম না। এইসব কলকাতার আর্টিস্টগুলো এক একটা ঘাগু মাল, অ্যান্টিক জিনিসপত্র হাতানোর জন্য এরা যা খুশি করতে পারে। দু-তিন বছর আগে সেম কেস হয়েছিল ওয়েস্টবেঙ্গলের একটা মন্দিরে। পুরোহিতকে খুন করে ঠাকুরের গয়না, অষ্টধাতুর মূর্তি, সব নিয়ে একটা গ্রুপ হাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সেখানেও পুরো ঘটনার পেছনে ছিল একজন আর্ট-কালেক্টর। পেপারে পড়েননি স্যার?

চুপ করুন মিস্টার গুরুং, তমাল বলে, হ্যাঁ, আপনার নাম?

সুদীপ্ত ঘোষ স্যার।

কী করা হয়?

আমি এমনিতে ডুয়ার্সের একটা স্কুলে ইতিহাস পড়াই, এখন নর্থবেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ করছি।

মিস্টার গুরুং, আপনি মঠের সবার স্টেটমেন্ট নিতে থাকুন আমি ততক্ষণ এঁর সঙ্গে কথা বলে নিই, তমাল বলে।

সুদীপ্ত এরপর তমালকে তাদের এখানে আসার কারণ, তার রিসার্চের বিষয় ইত্যাদি সম্পর্কে সব কথা খুলে বলে।

বাই দ্য ওয়ে সুদীপ্ত, এই ভদ্রমহিলার নাম কী? উনি আপনার কে হন? আত্মীয়? তমাল জিজ্ঞেস করে।

পরের পর প্রশ্নে বিভ্রান্ত সুদীপ্ত একবার ঢোঁক গেলে, সামান্য তোতলায়, ইয়ে মানে, উনি আমার পরিচিত। আত্মীয়-টাত্মীয় না। এমনি চেনাশোনা। ওঁর নাম মেঘনা সান্যাল। আপনি স্বদেশ পত্রিকার শিল্পকলা বিভাগে ওঁর ছবির প্রদর্শনীর খবর দেখেননি? এই তো দু-মাস আগেই হয়ে গেল। খুব বড়ো করে বেরিয়েছিল খবরটা। আমাদের আলাপও ছবির সূত্র ধরেই। অ্যাকচুয়ালি স্যার আমার আবার এসব দিকে একটু ইন্টারেস্ট আছে, সুদীপ্ত হাত দিয়ে কপালের ওপর এসে পড়া চুল সরায়, আমাদের প্রথম পরিচয় হয় ফেসবুকে। তারপর গতবছর চাপড়ামারি ফরেস্টে বেড়াতে এসে উনি আমাদের লাটাগুড়ির বাড়িতে যান। ওখানেই মাশানের শোলার মূর্তি দেখে এই বিষয়ে ছবি আঁকার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড হন। তারপর থেকে আমাদের এই নিয়ে মেইলে নিয়মিত কথাবার্তা হত। এর মধ্যে আমার বন্ধু কুশল, রংগলি ফরেস্ট অফিসের ইনচার্জ, দিন দশেক আগে আমাকে ফোন করে এই পটগুলোর কথা বলে। আমি সঙ্গে সঙ্গে দিদিকে ফোন করে সব কথা জানাই, আর দিদিও একদম সময় নষ্ট না করে, চটজলদি এখানে চলে আসেন।

মাশানের শোলার মূর্তি মানে! মাশান কী? আপনি তো বললেন কীসব পটের কথা, তমাল আগামাথা কিছুই বুঝতে পারে না।

স্যার, মাশান হলেন উত্তরবঙ্গের এক লোকদেবতা। আমাদের ওদিকে মানুষের মঙ্গল কামনায় অথবা অসুখ-বিসুখ বা প্রাকৃতিক কোনও দুর্যোগ হলে তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য মাশানের পুজো করার রীতি বহুদিন ধরে চলে আসছে।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, সুদীপ্তকে কথা শেষ করতে দেয় না তমাল, পরে এই বিষয়ে ডিটেইলসে শুনব। আগে ওই ভদ্রমহিলার ছবি দেখান, আপনি

তো বললেন ওঁর ফেসবুক ফ্রেন্ড, প্রোফাইলটা খুলুন দেখি। আর ভদ্রমহিলার নাম ঠিকানা সবকিছু মিস্টার গুরুং-এর কাছে দিয়ে দিন।

একজ্যাক্ট ঠিকানা তো বলতে পারব না স্যার, কলকাতায় থাকেন, এটুকু জানি, সুদীপ্ত মোবাইল খুলে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে মেঘনা সান্যালের ছবি বের করে তমালকে দেখায়, একটু দেখুন স্যার, যে করে হোক ওঁকে খুঁজে বের করতেই হবে, আমি দায়িত্ব নিয়ে ওঁকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম, এখন কিছু একটা হয়ে গেলে আমি সারাজীবন নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।

সুদীপ্ত কিন্তু খেয়াল করে না, এই ছবি দেখে তমালের আপাতকঠিন মুখে হঠাৎ করে একটা বিস্ময়ের ছাপ পড়েই আবার নিমেষে মিলিয়ে যায়।

হুম। প্রোফাইলটা আর ওঁর সেলফোনের নাম্বার আমাকে সেন্ড করে দিন, তমাল বলে, আর আপনার আই-ডি কার্ড, ফোন নাম্বার সব মিস্টার গুরুং-এর কাছে জমা দিয়ে দেবেন। ভালো কথা, এই তদন্ত শেষ না হওয়া অব্দি আপনি কিন্তু আরিতার ছেড়ে কোথাও যেতে পারবেন না। মিস্টার গুরুং-এর থেকে আমার অফিসের মেইল আইডি নিয়ে নিন। সব ডিটেইলস ইমিডিয়েটলি পাঠিয়ে দেবেন।

স্যার, আমার মোটামুটি এই মঠের সবার বয়ান নেওয়া হয়ে গেছে, গুরুং এসে জানায়, সবাই বলছে আটটার মধ্যে রাতের খাবার খেয়ে রিনচেন লামা তাঁর ঘরে ঢুকে যান। এটাই তাঁর প্রতিদিনের রুটিন ছিল। অন্যান্য শ্রমণেরাও সেসময় ঘরে চলে যায়। কালও সেম রুটিনেই সব চলেছে। ফলে তারপর কী হয়েছে, কেউ আর সে বিষয়ে কিছুই বলতে পারছে না। কোনোরকম চিৎকার চেঁচামেচি বা গন্ডগোলের টুঁ শব্দটিও কেউ পায়নি। লামাজির প্রতিদিন অনেক ভোরে উঠে প্রার্থনা করার অভ্যেস, আজ সাতটার পরেও তিনি উপাসনাঘরে আসেননি দেখে ক-জন

শ্রমণ তাঁর খোঁজ করতে গিয়ে দেখে, এই অবস্থা। তারপরই ওরা আমাদের ফোন করে।

ওকে, মিস্টার গুরুং, সুদীপ্তবাবু আপনাকে এই মহিলার সব ডিটেইলস মেইল করে দেবেন, আপনি ওঁর ফোটো সমস্ত পিসিতে, চেকপোস্টে পাঠিয়ে দিন, আর সবকটা বর্ডার সিল করার কথা বলে দিন। একটা কাক-পক্ষিও যেন বর্ডার দিয়ে পালাতে না পারে। ওঁর ফোন নাম্বারটা দিয়ে ফোনের লোকেশন ট্রেস করতে বলে দিন। আর ইমিডিয়েটলি কলকাতা পুলিশে ফোন করে ভদ্রমহিলার কলকাতার অ্যাড্রেস বের করে ডিটেইলসে খোঁজখবর করতে বলুন, মহিলা যেন কোনোভাবেই সিকিম থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে, ইটস মাই অর্ডার।

তমালের কথা শুনে সুদীপ্ত এবারে পুরো ঘাবড়ে যায়। পুলিশ কি মেঘনাকেই সাসপেক্ট বলে ভাবছে! ওর মাথায় কিছুই ঢোকে না। কেবল প্রচণ্ড একটা ভয় ওর বোধ-বুদ্ধি সব ঘেঁটে দেয়। এখন যদি ওকেও জড়িয়ে দেয়! ও ভালোমতোই জানে, ওরা ছাড়া আর-কোনো বাইরের লোক এই পটের ব্যাপারে কিচ্ছু জানে না, আর সেকথা মঠের লোকেদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেই বেরিয়ে যাবে। ও তো প্রতিদিন মেঘনার সঙ্গে মনাস্ট্রিতে গিয়েছে। পটগুলো নাড়াচাড়া করেছে। এখন ফিংগারপ্রিন্ট এক্সপার্ট দিয়ে টেস্ট করালে!

মিস্টার গুরুং, আপনার এদিকের কাজ সব হয়ে গেছে? তাহলে চলুন এঁদের হোমস্টেটা একবার দেখে আসতে হবে। আর একটা কথা, ইমিডিয়েটলি লামার ঘরের সামনে স্পেশাল পুলিশ পোস্টিং-এর ব্যবস্থা করুন।

তমালের কথায় সুদীপ্তর সংবিৎ ফেরে। বুঝতে পারে এখন থেকে পুলিশ যা বলবে ওকে সেই মতোই চলতে হবে। ও মোটামুটি নজরবন্দি হয়ে গেছে। কপাল ভালো যে এখনও জেলে ঢুকিয়ে দেয়নি।

সুদীপ্তকে নিয়ে গুরুং-এর জিপ এবং তমালের এসইউভি এবার হোমস্টের দিকে রওনা দেয়।

ওরা প্রথমেই মেঘনার ঘরে ঢোকে। তমালের সন্ধানী চোখ ছুরির ফলার মতো ঘরের চারদিকে ঘুরতে থাকে। যত ঝানু অপরাধীই হোক না কেন, কিছু-না-কিছু ফাঁক থেকে যাবেই।

মিস্টার গুরুং আপনি ঝটপট একটা লিস্ট বানিয়ে এই ভদ্রমহিলার সব জিনিস থানায় নিয়ে চলে যান। বেডসাইড টেবিলের উপর মেঘনার ল্যাপটপটা চার্জে বসানো। সেটা দেখিয়ে তমাল জিজ্ঞেস করে, সুদীপ্ত, আপনার এই ল্যাপটপের পাসওয়ার্ড জানা আছে?

এটা তো ওঁর পারসোনাল ল্যাপটপ, এর পাসওয়ার্ড আমি কীভাবে জানব স্যার!

সুদীপ্ত আমতা আমতা করে।

ঠিক আছে, মিস্টার গুরুং আপনি এক্ষুনি গ্যাংটকে ফোন করে এক্সপার্ট আনানোর ব্যবস্থা করুন, এটা ডিকোড করতে হবে। চলুন, এবার আপনার ঘরটা দেখব, তমাল গুরুংকে নিয়ে সুদীপ্তর ঘরের দিকে যায়।

সুদীপ্তর টেনশন বাড়তেই থাকে, অনবরত হাত কচলিয়েই যাচ্ছে। ভাগ্যে একফাঁকে বুদ্ধি করে কুশলকে ফোন করে দিয়েছিল। কুশলের মধ্যস্থতায় ঠিক হয়, ক-দিন সুদীপ্ত কুশলের কোয়ার্টারে, রংগলিতে থাকবে।

গুরুং আর তমাল চলে যাওয়ার পর সুদীপ্ত মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে— এতদিন শুধু লোকমুখে শুনে এসেছি, আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি পুলিশের হ্যারাসমেন্ট কী জিনিস! জাতটাই হাড়ে হারামি। কোথায় মেঘনাদিকে খুঁজে বার করবে, তা নয়, ওঁকেই ক্রিমিনাল ভেবে বসে আছে। যত্তসব...

সেটাই অবভিয়াস। রাতারাতি পটগুলো যাবে কোথায়! তুই কিন্তু এবার থেকে একটু বুঝেসুঝে স্টেপ ফেল। পুলিশের সামনে অত মেঘনাদি মেঘনাদি করার কী ছিল! গান্ডু একটা। এই বুদ্ধি নিয়ে তুই যে কী করে ছাত্র পড়াস! ভদ্রমহিলাকে কতদিন চিনিস! আর পরিচয়ও তো সেই ফেসবুকে। এখন এইসব ভার্চুয়াল

ফ্রেন্ডশিপ থেকে কতরকমের ক্রাইম হচ্ছে, তোর কোনও আইডিয়া আছে? হতেই পারে এই মহিলা আন্তর্জাতিক পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত। তোকে ঘুঁটি বানিয়েছে, কুশল সুদীপ্তর জিনিসপত্র গোছগাছ করতে করতে বলে, এখন তোকেও যদি জড়িয়ে দেয়, কোথাকার জল কোথায় গড়াবে তুই ভাবতে পারছিস!

তোর যুক্তি আমি মানছি। কিন্তু আমার কেন জানি মনে হয়, এটা সম্ভব না। না না, ওই লেভেলের একজন শিল্পী, এত শিক্ষিত মানুষ, হতেই পারে না, সুদীপ্তকে বিমর্ষ দেখায়।

ড্রাইভারকে জিনিসপত্র জিপে তুলতে বলে কুশল সুদীপ্তর পিঠে হাত রাখে, কাম অন সুদীপ্ত, বি রিজনেবল। পড়ে আছিস তো সেই ডুয়ার্সের একটা গণ্ডগ্রামে, তুই কী করে বুঝবি, এইসব শিক্ষিত লোকেরা যখন বদমাইশি করে, সেটা কত মারাত্মক হয়। পটগুলো তো অনেক বড়ো ব্যাপার, একটা বই হাতানোর জন্যও এরা কতদূর নিচে নামতে পারে, তুই জাস্ট কল্পনাও করতে পারবি না। হয়তো চুরি করতে গিয়েছিল, হয়তো লামাজি টের পেয়ে যাওয়ার ফলে বাধা দিয়েছিলেন, আর ওঁর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে বেশি জোর ফলিয়ে ফেলেছিল। লামাজির তো বয়েসও কম হয়নি, দুর্বল শরীরে ধকল নিতে পারেননি। আমি কিন্তু প্রথম থেকেই ভদ্রমহিলার মধ্যে এই পটগুলোর ব্যাপারে একটা অ্যাগ্রেসিভনেস লক্ষ্য করেছি।

২

তমাল থানায় পৌঁছেই মেঘনা সান্যালের ঘর থেকে সিজ করা জিনিসপত্র নিয়ে বসে পড়ে। ট্রেনিংয়ের সময় বারবার করে বলেছিল, কোনও জিনিসকেই তুচ্ছ করে না দেখতে। কোনটার থেকে যে মূলসূত্র বেরিয়ে আসবে তা বোঝা শিবের বাবারও অসাধ্য। সব জিনিসের লিস্ট গুরুং বানিয়ে ফেলেছে। লোকটা করিতকর্মা আছে। মেঘনার ওয়ালেটটা নেই। তার মানে... তমাল একটা সিগারেট ধরায়। সকাল থেকে একটানা কাজ করতে করতে মাথায় জং ধরে গেছে। কনস্টেবলকে ডেকে চা দিতে বলে।

মিস্টার গুরুং, ওয়ালেটে কী কী থাকতে পারে? টাকা, আই কার্ড, এটিএম কার্ড, পাসপোর্ট, উঁহু পাসপোর্ট ওয়ালেটে ধরবে না। এদিকে ভ্যানিটি ব্যাগটা জিনিসের সঙ্গেই আছে, তার মধ্যেও পাসপোর্টটা নেই। বুঝতে পারছেন, তার মানে মহিলা এদেশেই কোথাও ঘাপটি মেরে থাকার প্ল্যান করেছে। পাসপোর্ট আনেইনি হয়তো। ওই ছবিগুলো দিন তো দেখি।

গুরুং ছবিগুলো তমালের হাতে দিলে সে উলটে-পালটে দেখে। কতগুলো মুখ আর ফিগার পেন্সিলে স্কেচ করা, ঠিক মানুষের মতো নয়, কেমন জ্যামিতিক আকারের, কিছু কিছু ছবিতে আবার ঠাকুর-দেবতার মূর্তির আদল পাওয়া যাচ্ছে। কয়েকটা স্কেচ অসম্পূর্ণ। সাদা কাগজের ওপর শুধু কয়েকটা

পেনসিলের আঁচড়, দেখে মনে হচ্ছে শুরু করেছিল, কিন্তু কোনও কারণে মাঝপথে আটকে গেছে।

এগুলো স্যার, মাশানের ছবি, আমি জানি, গুরুং বলে, আমাদের এদিকে কেউ কেউ বাড়িতে কারোর অসুখবিসুখ হলে বা বিপদ-আপদ ঘটলে এই দেবতার পুজো করে।

হুঁ, ওই সুদীপ্ত ঘোষও ওই মাশানের কথাই বলছিল। তার মানে, তমালের কপালে ভাঁজ পড়ে, মনে হচ্ছে সুদীপ্ত যে পটের কথা বলছিল, এগুলো তারই স্কেচ। ইয়েস, আয়্যাম শিওর, এগুলো ওই পটের থেকেই স্কেচ করা। এর জন্যই ওই মহিলা সেই কলকাতা থেকে ছুটে এসেছে। নিশ্চয়ই এই পটের কোনও হিস্টোরিক্যাল ভ্যালু আছে। মিস্টার গুরুং, আপনি লামার ঘরে পটগুলো ঠিকমতো খুঁজেছিলেন? আমার মনে হচ্ছে কোথাও একটা ফাঁকি থেকে যাচ্ছে।

না স্যার, কোথায় পট, কোথায় কী! কত্ত খুঁজলাম, একেবারে নেই তো নেই-ই। আমি তো প্রথম থেকেই বলছি এই মেয়েছেলেটাই লামাকে খুন করে ছবিটবি সব নিয়ে ভেগে গেছে, আপনি আমার কথা কানেই তুলছেন না।

মঠের লোকেদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন ওগুলো কোথায় রাখা থাকত? না না, আপনার এনকয়ারি করা ঠিকমতো হয়নি মিস্টার গুরুং। আয়্যাম নট স্যাটিসফায়েড। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বিকেলের মধ্যে মেইল করে দিতে বলুন। আমি নিজে গিয়ে তার আগেই মঠের লোকজনের সঙ্গে একবার কথা বলব। সিএম মাত্র তিনদিন সময় দিয়েছেন। মনাস্ট্রির মধ্যে আচার্য খুন, এটা খুব সেন্সেটিভ ইস্যু। নয় নয় করে এই স্টেটে আমার দু-বছরের ওপর হয়ে গেল, এরকম ইনসিডেন্ট এই প্রথম। মিডিয়া আর পলিটিক্যাল পার্টিগুলো কলকাঠি নাড়া শুরু করার আগেই অ্যাকশন নিয়ে নিতে হবে। ওদের উস্কানিতে পাবলিক খেপে গেলেই মুশকিল। তখন

থানা অবরোধ, রাস্তা রোকো সব শুরু হয়ে যাবে। হাতে একদম সময় নেই।

এটা তো স্পেশাল কেস স্যার, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পেতে পেতে দেরি হবে। বোর্ড বসবে, তবে না পি এম, গুরুং মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলে।

তমালের একটা স্বভাব আছে অধৈর্য্য হলে একহাত মুঠো পাকিয়ে অন্য হাতের তালুতে ঘুসি মারা। এখনও সেই একইভাবে ঘুসি মারছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট না পাওয়া অব্দি ওর বিশেষ কিছু করার থাকছে না। একদিকে ওপরমহলের চাপ, তার ওপর আবার একজন মহিলা জড়িয়ে গেছে কেসটায়, পুরো ব্যাপারটা কোন দিকে গড়াবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তমালের মনে হয় নিজের মাথার চুল নিজেই বসে বসে ছেঁড়ে।

মঠের লোকেরা ছবিগুলো দেখে খুব একটা সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারল না। সহাধ্যক্ষ তমালকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁর ঘরে বসালেন— দেখুন এই ছবিগুলো আসলে তিব্বতের এক মঠ থেকে এসেছে। আমি শুনেছি, একসময় এদেশ থেকে বৌদ্ধদের প্রচুর ধর্মীয় পুথি, ছবি, মূর্তি তিব্বতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এগুলো আদৌ বৌদ্ধ ধর্মের কোনও দেবতার ছবি কি না, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় ছিল, আমরা সঠিক কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি। তাই এই পটগুলোর ব্যাপারে কেবল আমি আর আমাদের দেবলামাই জানতাম। সাধারণ শ্রমণদের কিছুই জানাইনি। আর, এমনিতেও এসব ওদের এক্তিয়ারের মধ্যেও পড়ে না। কিন্তু দেখুন কাণ্ড, বনবিভাগের ওই অফিসারকে উনি সব দেখিয়ে দিলেন। শুধু ওকে দেখালেও কথা ছিল, ওর কথা শুনে আবার ওর বন্ধুদেরও দেখালেন। কী কারণে জানি না, ওই অফিসারকে উনি খুব তোল্লাই দিতেন। এদিকে ওংলিং লামা আমাদের এই মঠের সবরকম চক্রের ছবিটবি আঁকার কাজ করে, ওকে কিন্তু দেবলামা কিছুই জানাননি। আমার তখনই

ব্যাপারটা ভালো লাগেনি। এগুলো আমাদের দেশের প্রাচীন ধর্মীয় সম্পদ, বাইরের একজন লোক, সে যত প্রিয়পাত্রই হোক না কেন, তাকে এইসব গোপন কথা বলা ওঁর উচিত হয়নি। আমি আর কী বলব, আমি তো সহকারি, এখানে ওঁর কথাই ছিল সব। ওই মেয়েটা আর ছেলেটা এসে প্রতিদিন এগুলোর ছবি এঁকে নিয়ে যেত। আমি বারবার নিষেধ করেছিলাম। উনি কানেই তোলেননি আমার কথা। এখন তো মনে হচ্ছে ওই ছেলেমেয়েগুলোই চুরি করেছে। আর ওই মেয়েটাকে দেখলেই বোঝা যায় খুব চালাক-চতুর। আমার বলা উচিত না, তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি, আচার্য এটা অন্যায় করেছিলেন।

লামা মাথা নিচু করে বসে থাকেন।

পটগুলো কোথায় রাখা ছিল? তমাল জানতে চায়।

ওগুলো সব আচার্যর ঘরের খাটের নিচে একটা বাক্সের মধ্যে ছিল। ওঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে আমি প্রথমেই গিয়ে ওগুলোর সন্ধান করি। দেখি যে, না আছে বাক্স, না আছে পট।

স্যার, গুরুং তমালের কানের কাছে মুখটা এনে ফিসফিস করে বলে, এখন তো আমার মনে হচ্ছে, শুধু মেয়েছেলেটা না, ওই ফরেস্ট অফিসার আর ওর বন্ধুরও এর সঙ্গে সাঁট আছে। এই লামা যা বলছে, তা যদি সত্যি হয়, তাহলে এগুলোর বাজারদর লাখ লাখ টাকা। আপনি শুধু একবার বলুন, থানায় এনে ভালোমতো হুড়ো দিলেই গলগল করে সব বলে দেবে। কত এরকম শ্লা হারামির... গুরুং জিভ কাটল। সরি স্যার, ছোটোলোকদের সঙ্গে ওঠবস করে মুখটাই এমন হয়ে গেছে।

ক্যুইক, চলুন আমি আচার্যর ঘরটা আবার দেখব, তমাল উঠে দাঁড়িয়ে সহাধ্যক্ষকে নমস্কার জানালো।

ঘরটা বড়োজোর দশ ফিট বাই বারো ফিট। একপাশে সরু একটা খাট, অন্যদিকে একটা বড়োসড় জলচৌকি, বোঝাই যাচ্ছে এটা ছিল পড়ার জায়গা। পুথিগুলো ছুড়ে ছুড়ে ফেলা হয়েছে। দেওয়ালে একটা

কাঠের র‍্যাক, যেখানে কিছু চিবর ঝোলানো ছিল হয়তো, এখন মাটিতে এলোমেলোভাবে পড়ে আছে। তমাল পকেট থেকে একটা ম্যাগনিফায়িং গ্লাস বের করে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। বেশ কয়েকটা পায়ের ছাপ। অন্তত দু-তিন জনের। হতে পারে এগুলো ওই ছেলেমেয়েগুলোর। কিন্তু ওরা তো ক-দিন ধরেই নিয়মিত যাতায়াত করেছে, আর সেটা সবাই দেখেওছে। এর থেকে আর নতুন করে কী এস্ট্যাবলিশ করা যাবে! তমালকে কিছুটা হতাশ দেখায়।

স্যার, ফরেন্সিকের এক্সপার্টরা এসে গেছে, গুরুং বলল।

ওদেরকে বলুন ঘরে যেসব ফিংগারপ্রিন্ট পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো খুঁটিয়ে দেখতে। আর স্নিফার ডগের ব্যাপারে গ্যাংটক থেকে কিছু জানিয়েছে? তমাল জানতে চায়।

হ্যাঁ স্যার, কাল সকালেই এসে যাচ্ছে, গুরুং বলল, আমি তাহলে ওদের নিয়ে আসি স্যার?

ফরেন্সিক টিমের লোকেরা স্যাম্পেল নিয়ে চলে যাওয়ার পর লামার ঘর সিল করে দিয়ে তমাল আর গুরুং নিজেদের আস্তানার দিকে রওনা দেয়। যেটা সংক্ষিপ্ত পথ, সেই রংপো রোড ধরে গেলেও মানখিম থেকে গ্যাংটক সেই আড়াই তিন ঘণ্টার রাস্তা, ওখান থেকে প্রতিদিন যাতায়াত করে এই কেসের তদন্ত করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাই ঠিক হয়েছে, আপাতত তমাল রংগলিতেই একটা সরকারি বাংলোতে থাকবে। সকাল থেকে কয়েক কাপ চা ছাড়া পেটে আর প্রায় কিছুই পড়েনি। খিদেটা তুমুলভাবে জানান দিচ্ছে।

কিন্তু খেতে বসেও শান্তি নেই, কেমন একটা অস্থির অস্থির লাগছে। তার মানে পুরো কেসটাতে মূল লক্ষ্য খুন নয়, আসল ব্যাপার হল পটগুলো। ওগুলো হাতানোর জন্যই এই খুন। কিন্তু খুনটা করল কে? খুনিকে শনাক্ত করে গ্রেফতার করতে পারলেই পটগুলোর সন্ধান পাওয়া যাবে। একইসঙ্গে মেঘনার

উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাও বেশ সন্দেহজনক। আরও ভালোভাবে খোঁজখবর করা দরকার। তমাল খেতে খেতেই বাঁ হাত দিয়ে ফোন থেকে ফেসবুকে লগ ইন করে। সুদীপ্ত মেঘনার প্রোফাইলটা সেন্ড করে দিয়েছে। ট্যাপ করতেই ওর ওয়াল খুলে যায়। সেই পরিচিত চেহারাটা আজও বদলায়নি, শুধু কিছু সময়ের দাগ লেগেছে। পেইন্টার লেখা আছে। বেশ কয়েকজন বিখ্যাত চিত্রকরও ওর ফ্রেন্ডলিস্টে আছেন। আর, মেঘনা তো... যতদূর মনে পড়ে শেষ অব্দি শান্তিনিকেতনেই ভরতি হয়েছিল। কিন্তু প্রোফাইলটা ফেকও হতে পারে। একটা ব্যাপারেই খটকা লাগছে, শুধু ফেসবুক ফ্রেন্ড হলে তার জন্য সুদীপ্তর এত দরদ কেন! নাকি মেঘনার হারিয়ে যাওয়া টাওয়া পুরোটাই সাজানো ব্যাপার! স্রেফ পুলিশকে বিভ্রান্ত করার একটা চাল। মনে হচ্ছে গুরুং-এর কথাই ঠিক, সুদীপ্তও কোনও না কোনোভাবে এই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। তমাল কলকাতা পুলিশে ফোন করে সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চকে দিয়ে প্রোফাইলটা ভেরিফাই করার কথা বলে। এই আরেক ঝামেলা। অপরাধ হয়েছে এক রাজ্যে, এদিকে সন্দেহের তালিকায় থাকা লোকেরা সব অন্য রাজ্যের। এখন কলকাতা পুলিশ কতটা গুরুত্ব দেবে কেসটাকে, কতটা সহযোগিতা করবে, সেটাও একটা চিন্তার বিষয়। ওদিকে আবার মোবাইল বাজছে, সিএমএর পিএ, জানতে চাইছে কেসটা সম্পর্কে। তমাল এবার বিরক্ত হয়, সেই সকাল থেকে লড়ে যাচ্ছে। একে তো এই অজ জায়গায় এসে পড়ে আছে, সবকিছু গ্যাংটক থেকে আনাতে হচ্ছে, তার ওপর এই তাগাদা। দুত্তোর, বলে হাতমুখ ধুয়ে তমাল একটা সিগারেট ধরায়। আজ আর কিছুই করা যাবে না। মেঘনার ল্যাপটপটা খুলতে পারলে তাও কিছু বোঝা যেত।

স্যার, ফরেন্সিকের ওরা এইমাত্র ফোন করেছিল, বলছে, রিপোর্ট আসতে কমসে কম একদিন সময় লাগবে, গুরুং-এর ফোন, আর ভালো কথা স্যার,

ল্যাপটপটা খোলা গেছে, লোকাল একটা ছেলে সফটঅয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, ছুটিতে বাড়ি এসেছে, ওকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নিলাম। একটু আনঅফিসিয়াল হল ব্যাপারটা, কিন্তু আপনি বললেন আর্জেন্ট, তাই... নিয়ে আসব স্যার?

বুঝলেন মিস্টার গুরুং, এই মহিলার ফ্রেন্ডলিস্টে দু-একজন বিদেশি আর্ট-কালেক্টরের নাম আছে, এটা খুবই সাসপিশাস। আমি অবশ্য অলরেডি কলকাতা পুলিশকে কনট্যাক্ট করেছি। দেখি ওরা কী বলে। আর আপনি এক কাজ করুন, মঠের আশপাশে কিছু ইনফর্মার লাগিয়ে দিন, পটগুলোর ব্যাপারে নতুন কোনও কথাবার্তা শুনলেই যেন আমাকে ইনফর্ম করা হয়। আর ল্যাপটপটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি নিজে এসে আমাকে দিয়ে যান। খবরদার, অন্য কারও হাতে দেবেন না। এই মুহূর্তে এটাই আমাদের সবচাইতে বড়ো ক্লু।

গুরুং চলে যেতেই তমাল মেঘনার ল্যাপটপ খুলে বসে। ডকুমেন্টসে ক্লিক করে ফাইলগুলো দেখতে দেখতে এক জায়গায় মাশান নামে একটা ফাইল দেখে তমাল ক্লিক করল। তমাল নিজেও উত্তরবঙ্গের ছেলে। কিন্তু বাবার বদলির চাকরির জন্য পাকাপাকিভাবে কখনই ওখানে থাকা হয়নি। তবে ছুটিছাটায় ওদের রাজাভাতখাওয়ার বাড়িতে এসে কতগুলো করে দিন কাটিয়ে যেত। মেঘনার ল্যাপটপে মাশানের ছবি দেখে ওর ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত তমালের এতটাই অদ্ভুত লেগেছিল ব্যাপারটা যে, আজও মনে আছে। ওদের পাশের বাড়ির মেয়ে বাসানি একবার নদীর ঘাট থেকে ফিরে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। কিছুই খেতে পারছে না, জল খেলেও বমি হয়ে যাচ্ছে। এরকম গুরুতর অবস্থাতেও বাসানির বাবা ডাক্তার না ডেকে, একজন দেবংশীকে ডেকে নিয়ে এলেন। তারপর কী যেন একটা পুজো হল, যতদূর মনে পড়ছে, সেই দেবতার মূর্তিও এরকমই দেখতে ছিল,

আর মূর্তিটা খুব সম্ভবত ছিল শোলার তৈরি। ওরা একটা পোড়া মাছ আর পায়রা বলি দিয়ে পুজো করেছিল, তমালের বেশ মনে আছে, সেই প্রথম ওর এরকম দৃশ্য এত কাছ থেকে দেখা। রক্ত দেখে কেমন গা গুলিয়ে উঠেছিল, সেবার ছুটিতে ও আর মাংস খেতে পারেনি। সত্যি, ছোটোবেলায় মানুষের মন কত সংবেদনশীল থাকে!

আচ্ছা, উত্তরবঙ্গের তো আরও কতরকম লোকবিশ্বাস আছে, কতরকম লোকশিল্পে সমৃদ্ধ এই অঞ্চল, সব ছেড়েছুড়ে মেঘনা সান্যালের মতো একজন নামী চিত্রকর এই মাশান নিয়েই পড়ল কেন, আর পটগুলো নিয়েই বা ওর এত মাতামাতি করার কী আছে! ছবিগুলো লাল সাদা কালো রঙে আঁকা, জ্যামিতিক আদলে রং করা। তমাল গুগল সার্চে 'মাশান' লিখল। কিছুটা পড়ার পর মাথা পুরো ভোঁ ভোঁ করতে থাকে, বুঝতে পারে পটগুলো দেশের কত বড়ো সম্পদ, এগুলো শুধুমাত্র শিল্প-সংস্কৃতির ব্যাপার নয়, এর সঙ্গে সিকিম, নেপাল তথা উত্তরবঙ্গ এবং আসামের ইতিহাস এবং শতাব্দীপ্রাচীন লোকবিশ্বাসের অনেক উপাদান জড়িয়ে আছে। বিদেশের শিল্পের বাজারে এসব জিনিসের অসম্ভব চাহিদা। এগুলোকে কোনোভাবেই দেশের বাইরে যেতে দেওয়া যাবে না। ওই সফটঅয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটাকে দিয়ে এই মেইলগুলো খোলাতে হবে, সবকটার প্রিন্ট নিতে হবে। গুরুংকে ফোনে ধরল, আপনি এই সুদীপ্ত আর কুশল সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নিন তো। বি কেয়ারফুল, কুশল আবার ফরেস্ট সার্ভিসের, একদম পাঁচকান করবেন না। নইলে ঝামেলা হয়ে যাবে।

তমাল শুতে গেল, ঘুম আসছে না। কীসের একটা অস্বস্তি ওকে তাড়া করে ফিরছে। এমনিতেই কোনও কেস সলভ না হওয়া অব্দি শান্তিতে ঘুমোনো ওর ধাতে নেই। তার ওপর এই কেসটার সঙ্গে দেশের পুরাতত্ত্বের একটা যোগ খুঁজে পাচ্ছে বলেই আরও

বেশি করে স্মাগলিংএর একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। নাহ, মেঘনার ল্যাপটপটা আরেকটু নেড়েচেড়ে দেখা যাক। তমাল ফাইলগুলোতে স্ক্রল করতে থাকে, একটু নিচের দিকে নামতেই একটা ফাইল পেয়ে যায়, 'ডকুমেন্টস অন মাশান'। তমাল উত্তেজিত হাতে ক্লিক করে, গট ইট! প্রায় হাজার দশেক ওয়ার্ডের এই ফাইলটা পড়তে পড়তে তমালের কপালে ভ্রুকুটি ফুটে ওঠে, হাউ ইন্টারেস্টিং! একজন গবেষকের সংগৃহীত একটি লোককাহিনি পড়ে চমকে ওঠে তমাল, এ তো রীতিমতো মিথ বা পুরাণের কাহিনির মতো, উত্তরবঙ্গের ছেলে হয়েও এতদিন জানতাম না! দেবী কালী একবার একলা এক নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন। হঠাৎই সেখানে ধর্মঠাকুরের আবির্ভাব হয়। সেই নদীর ঘাটেই তাঁদের মিলন হয়। এই মিলনের ফলেই জন্ম নিল মাশান। অশ্বারূঢ় এই মাশান বীরত্বের প্রতীক। স্ক্রল করতে করতে তমাল অবাক হয়ে যায়, ওরে বাবা, মেঘনা তো ভালোমতন পড়াশুনো করে গুছিয়ে কাজে নেমেছে! সব গবেষকদের নাম উল্লেখ করে তাঁদের মতামত লিখে লিখে রেখেছে। এখানে আঠেরো রকমের মাশানদেবতার উল্লেখ আছে। কতরকম নাম, এ তো মনে রাখাই কঠিন ব্যাপার! বাড়ীকা মাশান, তিসিলা মাশান, ঘাটিয়া মাশান, ছুঁচিয়া মাশান, চলান মাশান, বহিতা মাশান, কাল মাশান, কুহুলীয়া মাশান, নাঙ্গা মাশান... পড়তে পড়তে তমালের মাথায় ঢোকে পুরো বিষয়টা, উত্তরবঙ্গের এক সুপ্রাচীন লোকদেবতা হলেন মাশান। কিছু গবেষক বলেছেন, মানুষের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত কল্যাণ কামনায় এই দেবতার পুজো করা হয়। আবার কেউ বলছেন, এই দেবতা দেখতে করাল-দর্শন ও প্রকৃতিতে ক্ষতিকারক। তমাল বুঝতে পারে, আসল কথা হল, একসময় জীবিকার কারণে এই অঞ্চলের মানুষদের তরাই-ডুয়ার্সের ঘন জঙ্গলের ভেতরে যেতেই হত। সেই গভীর অরণ্যে সবসময় বিশুদ্ধ জল পাওয়া যেত না, বাধ্য হয়ে

দূষিত জল খেয়ে পেটে ব্যথায়, পথ হারিয়ে ফেলে বা বনের হিংস্র জন্তু-জানোয়ার, সাপখোপের কামড়ে প্রাণ হারাতেন প্রচুর লোক। তা ছাড়াও বন্যা, মহামারিতেও কত কত মানুষের প্রাণ যেত। এইসব বিপদ-আপদ আর দৈনন্দিন জীবনে নানা বাধা-বিপত্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে স্থানীয় মানুষেরা মাশানের পুজো করা শুরু করেন। কিন্তু, যাই হোক না কেন, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ, সবচাইতে বড়ো কথা হল, যুগ যুগ ধরে এই অঞ্চলের মানুষ এই লোকদেবতার পুজো করে এসেছেন এই বিশ্বাস নিয়ে যে, সমস্তরকম বিপদআপদ থেকে তিনি মানুষকে রক্ষা করবেন, পথ দেখাবেন।

উফ, কত তথ্য সংগ্রহ করেছে মেঘনা! এই যে আঠেরো রকমের মাশানের কথা লেখা আছে, এঁরা সকলেই পুরুষ। কোনও কোনও গবেষক বলেছেন, মাশানদেবতা নদীর ঘাটে মানুষকে ঘাট চিনিয়ে দেন, পথভ্রষ্ট ব্যক্তিকে পথ দেখান, আবার কিছু গবেষকের মতে, এঁরা দিন বা রাতের যে কোনও সময় নারী পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের ওপর ভর করেন। মাশান ভর করলে সেই মানুষ উনুনের পোড়া মাটি, পোড়া কাঠ, কয়লা এসব খেতে শুরু করে এবং শেষ অব্দি মারা যায়। প্রায় পাল রাজাদের সময় থেকে মাশানের ভাবনার সূত্র পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের নানা অঞ্চল, সিকিম, মেঘালয় এবং আসাম ছাড়াও বৌদ্ধ-ধর্ম প্রভাবিত শ্রীলংকা, নেপাল আর বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলে মাশানের আরাধনা প্রচলিত রয়েছে। শোলার তৈরি মাশানের মূর্তি আকৃতিতে জ্যামিতিক। প্রাচীন অঙ্কনশৈলীর ছোঁয়া মাশানের গঠনের মধ্যে এখনও রয়ে গেছে। এর থেকে এই দেবতার অস্তিত্বের প্রাচীনতা সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। এখানকার রাজবংশী জাতির মানুষের মধ্যে এই পুজোর প্রচলন দেখা যায়। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং,

কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, আলিপুরদুয়ার সব জায়গাতেই এই পুজো হয়। তবে স্থানভেদে মাশানদেবতার মূর্তিও বদলে বদলে যায়। কোথাও শোলার মূর্তি, কোথাও আবার মাটির। নাহ ভালোই পড়াশুনো করে কাজে নেমেছে মেঘনা।

এতক্ষণে তমাল বুঝতে পারে, কেন এত বিষয় থাকতে মাশান নিয়েই পড়ল মেঘনা। কিন্তু আজ আর মাথায় নিচ্ছে না। কাল ভোরে আবার এই ফাইলটা নিয়ে বসতে হবে। এটাকে পুরোপুরি উদ্ধার করতে পারলেই কেস আদ্ধেক সলভ হয়ে যাবে। অ্যাকর্ডিং টু সুদীপ্ত, পটগুলো যদি মাশানেরই হয়, তাহলে তমাল নিশ্চিত যে ওগুলো চুরির জন্যই লামাকে খুন করা হয়েছে। পাল রাজাদের সময় মানে, তখন বাংলায় বৌদ্ধ-ধর্মের রমরমা। কে জানে দুটো সামহাউ লিংকড কি না! মেঘনার নোটসগুলো পড়া শেষ হলে হয়তো ভালোভাবে ক্লিয়ার হবে বিষয়টা। নেট দেখে ওর যা প্রেডিকশন, তার সঙ্গে মেঘনার তথ্যগুলোও যদি মিলে যায়, তাহলে এই পটগুলো তো আন্তর্জাতিক চোরাচালানের বাজারে রীতিমতো হটকেক। ওই সুদীপ্তর সঙ্গেও কালই কথা বলতে হবে। ও ব্যাটা আবার এই নিয়েই রিসার্চ করছে, নিশ্চয়ই কিছু হদিশ দিতে পারবে। কিন্তু মেঘনার একার পক্ষে কি সম্ভব লামাকে খুন করা! আর, শুধু পটগুলো হাতানোর জন্য খুন করার দরকারটাই বা কী, অজ্ঞান করেই তো কাজ হাসিল হয়ে যায়। তা ছাড়াও খুন করা কি অতই সহজ! বডি দেখে তো মনে হচ্ছে রীতিমতো পাকা হাতের কাজ। নাকি আরও কেউ জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে, বড়ো কোনও পাচারচক্র, মেঘনাকে পয়সার লোভ দেখিয়ে স্কেপগোট করেছে! মেঘনা কি ওই দলেরই কেউ? একের পর এক জিজ্ঞাসার ঢেউ আছড়ে পড়তে থাকে তমালের মনে। ধুস, আর ভাল্লাগছে না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল তমাল। রংগলি ছোটো জায়গা, উচ্চতা তেমন বেশি

না, তবু জনবসতি কম বলে মার্চ মাসের শেষেও বেশ ঠান্ডা রয়ে গেছে। তমাল ড্রেসিং গাউনটা ভালো করে জড়িয়ে নিল। ভাববে না ভাববে না করেও শেষতক ভাবনাটায় আর লাগাম পরাতে পারছে না। এগারো বারো ক্লাস, কলকাতার স্কুল। মেঘনা সান্যাল। ক্লাসের ছেলেদের হার্টথ্রব ছিল মেয়েটা। আড়ালে অনেক কথা বললেও, ওই বয়েসেই অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের জন্য কেউই মেঘনার দিকে এগোতে সাহস করত না। দীপকস্যারের ম্যাথস কোচিংএ সেই মেঘনা সান্যালের সঙ্গেই হঠাৎ করে দেখা হয়ে যাবে সেটা স্বপ্নেও ভাবেনি তমাল। কোচিং ক্লাসে তখন বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে, সাধারণত ইলেভেনের ক্লাস শুরুর আগেই সবাই ভরতি হয়ে যেত লম্বা সিলেবাসের কারণে। কিন্তু কে জানে কী কারণে মেঘনা বেশ কয়েকমাস বাদে এসে ভরতি হয়েছিল। স্কুলের বাইরে এই প্রথম দেখা। সেই বয়েসটাই এমন অলৌকিক যে মেয়েদের সংস্পর্শে এলে এক অদ্ভুত গা শিরশির করা অনুভূতি, একটা চিনচিনে মনকেমন করায় ভরে উঠত ভেতরটা। স্বভাবতই ক্লাসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় মেয়েটাকে আরও কিছুটা অতিরিক্ত সময় দেখতে পাবে ভেবেই ভালোলাগায় মন ভরে গিয়েছিল। মেঘনা অবশ্য পাত্তা দেওয়ার মেয়ে না। আর তখনকার দিনে কোএড স্কুলেও ছেলেমেয়েদের মধ্যে এখনকার মতো বন্ধুত্ব তৈরি হত না। কিন্তু জীবনে কিছু কিছু ঘটনা এমন আশ্চর্যভাবে ঘটে যায়, মানুষের তার ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

সেটা সেপ্টেম্বর মাস। পুজো আসব-আসব করছে। এদিকে সামনেই স্কুলের হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষা। সেদিনই স্যারের কাছে পরীক্ষার আগে শেষবারের মতো যাওয়া, ফলে সবাই নিজের নিজের সমস্যা নিয়ে স্যারের কাছে দেখাতে দেখাতে বেশ দেরি হয়ে গেল। তার ওপর সকাল থেকেই আকাশ থমথমে হয়ে ছিল, বাইরে বেরোতে না বেরোতেই একেবারে ভেঙে নামল ভাদ্র শেষের বৃষ্টি। তমালের সঙ্গে ছাতা

নেই। চিরদিনের ডাকাবুকো তমাল ছাতা টাতা বয়ে বেড়ানোর ছেলেই না। কিন্তু সেদিন আকাশের থেকে যেন ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি হোস পাইপ দিয়ে জল ঢালছে তো ঢালছেই। কিছুক্ষণ দাঁড়ালে যদি বৃষ্টিটা ধরে আসে, তমাল স্যারের ফ্ল্যাটবাড়ির নিচে অপেক্ষা করবে ভাবল।

কি রে ছাতা আনিসনি? প্রশ্নটা শুনে চমকে ওঠে তমাল। পাশে মেঘনা এসে দাঁড়িয়েছে।

নাহ।

সেরেছে, এখন বাড়ি ফিরবি কী করে? বাসে ওঠার আগেই তো ভিজে চুব্বুস হয়ে যাবি।

ও কিছু একটা করে ম্যানেজ হয়ে যাবে।

চল, আমার ছাতা আছে।

না না ঠিক আছে, তুই যা।

বেশি কায়দা করতে হবে না। পরীক্ষার আগে ভিজলে নির্ঘাত জ্বর। চল বলছি।

একটা লেডিস ছাতার নিচে যতটা জায়গা, তা দুজনের বৃষ্টি থেকে বাঁচার চাইতেও ঘেঁষাঘেঁষির জন্য বেশি অনুকূল। এই প্রথম কোনও অনাত্মীয় নারী শরীরের এতটা কাছে এল তমাল। মেঘনার শরীরে যেন বৃষ্টিরেণুর গন্ধ, তমাল উড়ে যাচ্ছে, তমাল ভেসে যাচ্ছে। বুকের ভেতর কেমন টনটন করে উঠল। এক্ষুনি যেন হৃদপিণ্ডটা বাইরে বেরিয়ে আসবে, এমন ধকধক করছে। এখন যদি কেউ বলে, তমাল তুমি মরে যাও, এমনকি মরেও যেতে রাজি তমাল। আড়চোখে মেঘনাকে দেখে, ওর কি কিছুই হচ্ছে না!

রাস্তায় নেমে দেখে প্রায় এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে গেছে। যাই হোক, তার ভেতরেও কোনোরকমে একটা অটো পাওয়া গেল। কলকাতার রাস্তায় অটোর জন্য যতই জ্যামজট হোক না কেন, এই অটো পরিষেবাই সাধারণ মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অটোতে বসে তমাল ভয়ে ভয়ে মেঘনার হাতটা ধরে।

থ্যাংকস।

কী আশ্চর্য, মেঘনা কিন্তু রাগ করে না! এই বৃষ্টিভেজা সন্ধে, ষোলো বছরের দুই কিশোর কিশোরীর জীবনে এক নতুন রসায়ন তৈরি করে, যা অনাস্বাদিত দুজনের কাছেই। প্রেম ভালোবাসা, এসব তো গল্পে উপন্যাসে পড়া, উপন্যাসের ছায়া যখন জীবনে পড়ে, অথবা জীবনই উপন্যাস হয়ে ওঠে, ষোলো বছরের জীবন জানে না সেই ঢেউ কী করে সামাল দিতে হয়। কেউ কেউ ভেসে যায় মহাসমুদ্রে, আবার কেউ কেউ একে অপরের বৈঠা হয়ে চালিয়ে নিয়ে যায় ভেলা। সেদিন দেশপ্রিয় পার্কে নামার আগে মেঘনা যে ওর হাতটা আলতো করে ছুঁয়ে দিয়ে গেল, সেটা কি অসাবধানে, নাকি ইচ্ছে করেই যেন জানান দিয়ে গেল, আমি আছি। রাতে তমালের আর ঘুম এল না। বাড়ি ফিরে এমনকি হাতও ধোয়নি, এই হাত মেঘনা ছুঁয়েছে, এই হাত কি আর ধোয়া যায়! সোজা নিজের ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। মা বারবার করে খেতে ডাকলেও বাইরে আসেনি। তমালের যেন জ্বর এসেছে। যেন জোয়ার এসেছে। একটা পেলব হরিয়াল পাখি ঢুকে গেছে বুকের ভেতর, তার লাবডুব শুনতে শুনতে শেষ রাতের দিকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে টেরও পায়নি।

৩

রংগলিতে কুশলের অফিসের সঙ্গেই লাগোয়া ছোট্ট বাংলো। সারাদিনের ধকলে যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে পড়ছে, ঘরে ঢুকেই কুশল কাজের লোককে চা দিতে বলে। সুদীপ্তর কিন্তু চায়ের দিকে মন নেই। কী যেন ভেবেই চলেছে।

কী রে, তোর চা তো জল হয়ে গেল, আরেকবার দিতে বলি? কুশলের প্রশ্নে সুদীপ্তর ঘোর ভাঙে,

চাপ নিস না, আমি একটু ঠান্ডা চা-ই পছন্দ করি, চায়ের কাপ হাতে তুলে নেয় সুদীপ্ত। কিচ্ছু ভালো লাগছে না রে, পটগুলো এভাবে উধাও হয়ে গেল, এখন যদি পুলিশ আমাকেই ধরে! কী যে করি! এখন ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফিরতে পারলেই বাঁচি। চুলোয় যাক রিসার্চ।

যাক, সুবুদ্ধি হয়েছে তাহলে! এতক্ষণ ধরে তো মেঘনাদি মেঘনাদি করে হেদিয়ে মরছিলি। শালা, বুঝিস না, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আমি কোথায় ভাবলাম এই পটগুলোর ব্যাপারে তোকে জানালে তোর রিসার্চ-পেপারটা অন্যরকম হবে, আর তুই ওকে সুদ্ধ নিয়ে এসে হাজির হলি। নিজের ভালো তো পাগলেও বোঝে। কিছু লটরপটর কেস নাকি? নইলে এত ইমপর্ট্যান্ট সব তথ্য কেউ অন্যের সঙ্গে শেয়ার করে! মাঝের থেকে লামাজির মতো একটা মানুষ বেঘোরে প্রাণটা দিলেন। এত্ত খারাপ লাগছে!

এই একদম যা তা কথা বলবি না কুশল, অন্য কিছুই না, তুই কি জানিস এই রিসার্চের ব্যাপারে কত

ইনফর্মেশন, কত বইয়ের সন্ধান মেঘনাদি আমাকে দিয়েছেন! আমি তো জাস্ট মাশানদেবতা কী, কত রকমের হয়, কেন এঁদের পুজো করা হয়, এসব নিয়েই পেপার লেখা শুরু করেছিলাম। মেঘনাদিই আমাকে প্রথম বৌদ্ধ-ধর্মের সঙ্গে মাশানের সংযোগের কথা বলেন।

কী বলছিস! কুশলের চোখেমুখে বিস্ময়, আমি তো ভেবেছিলাম তোর গাইড এগুলো তোকে বলেছেন। নাহ, তাহলে মানতেই হচ্ছে ভদ্রমহিলার ফান্ডা আছে।

জানিস, বাংলাদেশের দিনাজপুর আর রংপুর জেলাতেও মাশানের পুজো হয়। সেখানে আবার মাশানের সঙ্গে সঙ্গীদেবতা হিসেবে বারোজন দেবদেবী যেমন, হনুমান, কালী বুড়ি, শীতলী বুড়ি, লেংড়ী কালী, শ্মশানকালী, চামুণ্ডা, চণ্ডী, ভদ্রকালী, হরি, বৈরী কালীও থাকেন। তার মধ্যে আবার মুসলমান পিরও আছেন। গ্রামের লোকেরা বলেন, এঁরা সবাই ভাইবোন। পির হলেন মাশানের ভাগ্নে। একসময় তো আমাদের দেশে সব জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিল। তারই প্রভাব পড়েছে এই পুজো-পদ্ধতিতে।

সবই তো বুঝলাম, কিন্তু, এর সঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্মের কী যোগ পেলি? কুশলের ভেতরেও একটা আগ্রহ তৈরি হচ্ছে।

বলছি বলছি, এত অধৈর্য হলে চলে! অবিভক্ত ভারতবর্ষে সিল্করুট ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। এই পথ দিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসায়ী আর বৌদ্ধ শ্রমণেরা যাতায়াত করেছেন। তাঁর ফলে এখানে তিব্বত, ভুটান, নেপাল, বিহার, কামরূপ, কামাক্ষ্যা সব জায়গার কালচার এসে মিশেছে। তা ছাড়াও তুই খেয়াল করে দেখবি, এখনও প্রচুর বৌদ্ধ-ধর্মের মানুষ-জন এই অঞ্চলে বাস করেন।

এটা তুই ঠিকই ধরেছিস, সুদীপ্তর মুড একটু ভালো দেখে কুশল খুশি হয়, এই কারণেই উত্তরবঙ্গ আর

সিকিমে দু-পা গেলেই একটা করে মনাস্ট্রি। বাকি ভারতবর্ষের আর কোথাও-ই এত মঠ দেখা যায় না।

এরই ছাপ পড়েছে লোকসংস্কৃতিতে, নিজের বিষয় নিয়ে কথা বলতে পেরে সুদীপ্ত এখন একটু চনমনে। বলে, তারপর জানিস তো, এই কথা মেঘনাদিকে একদিন গল্পের ছলে বলতেই, উনি বললেন, মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মের পুরোনো বইগুলোতে ধারণী বলে একটা টার্ম ইউজ করা হয়েছে। এই ধারণী হল নানারকম বিপদ-আপদ থেকে রক্ষার পাওয়ার জন্য দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে লেখা এক মন্ত্রশাস্ত্র। মেঘনাদি নাকি কলেজস্ট্রিটের পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে 'পঞ্চরক্ষা' বলে এরকম একটা ধারণীর সংকলন পেয়েছেন। তারপর গোটা বইটা জেরক্স করে আমাকে পাঠিয়ে দেন। ওটা পড়ে আমার রিসার্চের ডিকশনটাই বদলে গেছে। তুই জাস্ট ভাবতে পারবি না কুশল, মাশানের কনসেপ্টের সঙ্গে এর কত মিল! বিভিন্ন অসুখ-বিসুখ, বিষাক্ত পোকামাকড়, সাপখোপের আক্রমণ, ন্যাচারাল ক্যালামিটি, এসব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই মন্ত্রশাস্ত্র লেখা হয়েছে। আমার গাইডকে এই কথা বলতে, উনিও বললেন, বৌদ্ধশাস্ত্রের তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ করা বই হল তাঞ্জুর ও কাঞ্জুর গ্রন্থমালা, সেই বইগুলিতে আর চিনদেশের ত্রিপিটকেও এরকম ধারণীর কথা আছে।

তার মানে এই সময় থেকেই আর এই ধারণীর চিন্তা থেকেই মাশানের ভাবনার সূত্রপাত বলা যায়, মাশানদেবতার পুজোও তো এইরকম সব বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধারের জন্যই করা হয়? এতক্ষণ কুশল বেশ আয়েশ করে বসে সুদীপ্তর কথা শুনছিল, এবার তার শরীরের ভাষাই বদলে যায়, সোজা হয়ে বসে, ভেরি ইন্টারেস্টিং, তোরা তো কামাল করে দিয়েছিস!

ঠিক এইসময় থেকেই বলা যায় না, তবে, মাশানের ভাবনা থেকেই ধারণীর কনসেপ্ট এসেছে, না ধারণীর কনসেপ্ট থেকে মাশানের ভাবনা এসেছে সেটাই খুঁজে

বের করার চেষ্টা করছি, সুদীপ্ত বলে, কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ বলেছেন, এই মন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল বজ্রযানী বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বীজ। এই তান্ত্রিক বৌদ্ধ-ধর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন বইতে সাধনা ও সিদ্ধি, মুদ্রা ও ধ্যান, পুজো ও দেবদেবীর মূর্তিকল্পনা, বিভিন্ন ধরনের যোগের কথা আলোচনা করা হয়েছে। মূল বৌদ্ধ-ধর্মে কিন্তু এইসব আচার-অনুষ্ঠানের কথা পাওয়া যায় না, বরং হিন্দুদের বিভিন্ন রীতি-রেওয়াজের সঙ্গে এর মিল আছে। আর এগুলোই পরে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন আচারের সঙ্গে মিলেমিশে এক সহজিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম তৈরি হয়। আসলে, ব্রাহ্মণ্যবাদ আর তুর্কীদের আক্রমণের কারণে এমন একটা সময় এসেছিল, যখন কৌমসমাজের লৌকিক ধর্মের কাছে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া বৌদ্ধ-ধর্মের আর কোনও উপায় ছিল না। ফলে বৌদ্ধ-ধর্মকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল কৌমসমাজের ধর্ম। এই সহজিয়াপন্থীদের মধ্যে দেবদেবীর মূর্তি পুজো আর অনেকটা বাউল-ফকিরদের মতো বিভিন্ন সাধন পদ্ধতি দেখা যায়, যা মূল বৌদ্ধ-ধর্মে কোনোদিনই ছিল না। এরা তন্ত্রসাধনা করে। মূল বৌদ্ধ-ধর্মে কিন্তু তন্ত্রসাধনার কোনও সিনই নেই। এই ব্যাপারগুলো মেঘনাদি আমাকে না জানালে এই অ্যাঙ্গেল থেকে আমি ভাবতামই না। তার ক-দিন পরেই জলপাইগুড়ির লোকসংস্কৃতির গবেষক কল্লোল বিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের ইউনিভার্সিটির একটা সেমিনারে আমার কথা হয়, ওঁর মতেও এই লোকদেবতা মাশান আর তান্ত্রিক বৌদ্ধ-ধর্মের মধ্যে এক গভীর যোগ রয়েছে।

দাঁড়া দাঁড়া, তুই তো একেবারে তুফানমেল চালিয়ে যাচ্ছিস। একসঙ্গে এত কথা আমার মোটা মাথায় হজম হয় কখনও! কুশল বলে।

জানিস তো, পটগুলো থাকলে, সেটাও বৌদ্ধ-ধর্মের সঙ্গে মাশানকে লিংক-আপ করার একটা সূত্র হত। কিন্তু, ওগুলো এভাবে উধাও হয়ে গিয়ে মহা মুশকিলে পড়লাম। পটগুলো নিয়ে আরও একটু

খোঁজখবর করতে পারলে নিশ্চয়ই একটা দিশা পেতাম। কিচ্ছু ভালো লাগছে না রে।

শোন, এই নিয়ে যত টেনশন করবি ততই ঘেঁটে যাবি। অনেক হয়েছে, আর না, রিসার্চ আগে না নিজের শরীর আগে! তার ওপর পুলিশ যদি কেস দিয়ে দেয়, তাহলে এই যে করে কম্মে খাচ্ছিস, সেই চাকরিটাও চলে যাবে। কুশল সুদীপ্তর পাশে এসে বসে, কাম অন, বি কুল। চল এবার কিন্তু সত্যিই অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। এরপর আবার কাজের লোকটাও ঘুমিয়ে পড়বে, চল ডানহাতের কাজটা সেরে নিই। পেটের মধ্যে ছুঁচো ডন দিচ্ছে। তোর তো আবার পড়াশুনো পেলে খিদের কথাও মনে থাকে না।

খাওয়াদাওয়ার পর সুদীপ্ত আবারও গম্ভীর, কী যেন ভেবেই চলেছে। কুশল এটা সেটা জিজ্ঞেস করলে দায়সারাভাবে হুঁ হ্যাঁ করে উত্তর দিচ্ছে দেখে কুশলও আর বেশি ঘাঁটায় না ওকে। বেচারা এমনিতেই সেই সকাল থেকে ছুটোছুটি করে একেবারে হা-ক্লান্ত হয়ে আছে, তার ওপর মনমেজাজও ঠিক নেই, বরং যদি একটু ঘুমোতে পারে কিছুটা হলেও ফ্রেশ লাগবে। ওর নিজেরও আর শরীর চলছে না। বন্ধুকৃত্য অনেক হল। এখন শুতে না গেলে বেকার বেকার আরেকটা সিএল নষ্ট হবে। পরের ভালো করতে গিয়ে শেষ অব্দি এইরকম একটা ঝামেলায় জড়িয়ে যাবে কে জানত!

আমি ঘরে গেলাম রে, তুই তো এখনও চেঞ্জও করলি না। ওই ঘরে ড্রাইভার তোর ব্যাগ রেখে গেছে। যা, চেঞ্জ করে একটু ঘুমানোর চেষ্টা কর। অ্যাকচুয়ালি ইউ নিড আ ডিপ স্লিপ। ওষুধ আছে কিন্তু, দেব? কুশল চোখ মটকে ইঙ্গিত করে।

না রে, আমি একটু বারান্দায় বসে থাকি, তুই যা, আমাদের জন্য তোরও যা ধকল গেল, কাল তো আবার তোর অফিস আছে, তুই শুয়ে পড়।

এগারোটা বেজে গেছে। সুদীপ্তর চোখে ঘুম নেই। এই ছোটো পাহাড়ি শহর ততক্ষণে পুরো শুনশান। কেবল দূরে দূরে পাহাড়ের গায়ে ইতস্তত ছড়িয়ে

থাকা তারার মতো কিছু আলোর বিন্দু ছাড়া সবখানেই চাপচাপ অন্ধকার। কোয়ার্টারের সামনের ল্যাম্পপোস্টের আলোও ঝাপসা হয়ে আছে গাঢ় কুয়াশায়। আর এই কুয়াশার মধ্যেও থোকা থোকা জোনাকি জ্বলজ্বল করে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। বাইরে একটা কুকুর ডেকে উঠেই চুপ করে গেল। সুদীপ্ত ঘরে গিয়ে মোটা জ্যাকেটটা পরে নিল। রুকস্যাকটা পিঠে লাগিয়ে বারান্দায় এসে জ্যাকেটের চেনটা ভালো করে টেনে দিল। পকেট হাতড়ে দেখে নিল মোবাইলটা ভরেছে কিনা। সাবধানে গেট খুলে বাইরে এল। ঠান্ডা হাওয়াটা যেন ঝাঁ করে শরীরের ভেতর ঢুকে গেল। সুদীপ্ত হাঁটার গতি দ্রুত করল। লোকবাহাদুরকে আগে থেকেই বলা ছিল। মোড়ের মাথায় যেতেই গাড়িটা নজরে এল। ফোন করা যাবে না। তাহলেই পুলিশ ট্রেস করে ফেলবে। সুদীপ্ত চারিদিকে ভালোমতো নজর করে নিয়েই ঝট করে গাড়িতে উঠে বসে। সামনেই পুলিশ চৌকি। এ জায়গাটা সাবধানে যেতে হবে। ও যতটা সম্ভব গাড়ির একদম পেছনের সিটের সঙ্গে শরীর মিশিয়ে বসে থাকল। মোবাইলটা স্যুইচ অফ করে ব্যাটারি খুলে জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে রেখে দিল, নইলে ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করেই পুলিশ সব বুঝে যাবে। অনেক শিক্ষা হয়েছে, ও আর পুলিশের ঝামেলায় জড়াতে চায় না। তাহলে সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই এলাকা ছেড়ে পালাতে হবে। কালো জিনসের প্যান্ট, কালো হুডেড জ্যাকেটে সুদীপ্তকে অনেকটা হলিউডি সিনেমার সুপার হিরোদের মতো দেখাচ্ছে।

**

পরদিন সকালে আরিতার মঠের ছোট্ট চত্বর কেঁপে উঠল ভারি বুটের আওয়াজে, হিংস্র স্নিফার

ডগের উত্তেজিত দৌড়ের শব্দে। মানখিমের মতো ছোট্ট গ্রামে, তথা সিকিমের মতো শান্তিপূর্ণ রাজ্যে, এ ঘটনা বিরলতম। তমালের চলাফেরাই আজ বদলে গিয়েছে। কুকুরগুলো মাটি শুঁকতে শুঁকতে উত্তেজিত পায়ে অধ্যক্ষের ঘরের দিকে দৌড়ে গেল। সেখানে কিছুটা সময় সব আসবাবের ওপর নাক ঠেকিয়ে গন্ধ নিল, তারপর বাইরে এসেই প্রায় চেন ছিঁড়ে দৌড় লাগাতে চাইল মেইন রোডের দিকে। ট্রেনার যা বোঝার বুঝে নিয়ে, ওদের নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। মিস্টার গুরুং কুইক, তমাল নিজের গাড়িতে বসে ডেকে নিল গুরুংকে। দুটো গাড়ি ছুটে চলল। রবিন রাইয়ের হোমস্টের সামনে এসে থামল গাড়িদুটো।

রবীনের এমনিতেই মন-মেজাজ ভালো নেই, এই ঘটনার পর ওর হোমস্টেতে আর ট্যুরিস্ট আসবে কি না তার ঠিক নেই। সিকিমে পর্যটন সবচাইতে বড় শিল্প। কত পরিবারের দিন গুজরান হয় হোমস্টে চালিয়ে, তাতে যদি ভাঁটা পড়ে তবে এখানকার মানুষজনের বড়ো বিপদ। পুলিশের গাড়ি দেখে আরও খিঁচড়ে গেল মেজাজটা। মেঘনা আর সুদীপ্তর ঘর দুটো সিল করাই ছিল। আজ পুলিশ এসে আবার খুলল। এখানেও একদফা কুকুর দিয়ে অনুসন্ধান চলল। হঠাৎ করেই কুকুরগুলো সামনের ভিউ পয়েন্টের দিকে ছুট লাগায়। তমালও প্রায় দৌড়ে ওদের অনুসরণ করে চলে। বেঁটে আর ভারী শরীর নিয়ে গুরুংও হাঁফাতে হাঁফাতে ওর পেছন পেছন দৌড়ায়। ভিউ পয়েন্টের পরেই পাইনের জঙ্গল শুরু হয়েছে। তার ভেতর দিয়ে পায়ে চলা পথ চলে গেছে লামপোখরি লেকের দিকে। কুকুরগুলো সেই রাস্তার এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গন্ধ শুঁকতে থাকে। জায়গাটায় পৌঁছে এদিক-ওদিক দেখে একটা বোতল তুলে এনে গুরুং বলে, স্যার এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেউ মাল খেয়েছে।

পাইন বনের ভেতর দিনের বেলাতেও অন্ধকার, তমাল টর্চ ফেলে কিছু পায়ের ছাপ দেখতে পায়।

কিন্তু তাতে করে কি প্রমাণ হয় যে অপরাধী বা ওদের দলই এখানে ছিল! কোনও ট্যুরিস্টদের দলও তো হতে পারে। কিন্তু গুরুংএর ভুল হতে পারে, তমালেরও হতে পারে, কুকুরগুলোর তো ভুল হওয়ার কথা না। তমালের ভুরু কুঁচকে থাকে। ভাবনাটা কিছুতেই ঠিকমতো দানা বাঁধছে না। কিছু সূত্র মনের মধ্যে এসেও আবার তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই কোনও দিশা পাওয়া যাচ্ছে না।

মিস্টার গুরুং আমরা আশপাশের সব জায়গায় চিরুনিতল্লাশি চালাব, একজন মহিলা বা তার দলবল এই কড়া পুলিশি পাহারার মধ্যে বেশিদূর যেতে পারবে না। তার ওপর আর্মি এরিয়া। ফোনের লোকেশন ট্রেস করা গেল? আর শুনুন, সুদীপ্ত আর মেঘনা সান্যালের লাস্ট কয়েকমাসের কললিস্ট চেক করতে বলে দিন। তমালকে বেশ অধৈর্য দেখায়।

না স্যার, ফোনটা সেই গতকাল থেকেই সুইচড অফ বলছে। আমি লোক লাগিয়ে দিয়েছি স্যার, কিছু একটা উপায় হবেই। আপনি তো শুধু মঠের আশেপাশে খোচর লাগাতে বলেছিলেন, আমি এদিককার সব খবরিকেই বলে দিয়েছি। আজকের মধ্যে কিছু না কিছু জানা যাবেই, গুরুং তমালের থেকে তারিফ আশা করে।

তমাল কিন্তু হুঁ হ্যাঁ কিছুই বলে না। কী যেন ভাবছে। মেঘনা কি এতটাই বদলে গেল! সেই মেঘনা, যে জীবনে একটা মিথ্যে কথা বলতে গেলেই দশবার তোতলাতো, কারোর কোনও অন্যায় দেখলেই প্রতিবাদ করত, এমনকি এর জন্য স্কুলে বন্ধুদের সঙ্গে মারপিট অব্দি লেগে গেছে কতদিন, সেই মেঘনা আন্তর্জাতিক পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত! হতেই পারে না, আবার হতেও তো পারে। সময় এবং পরিস্থিতি মানুষকে এতটাই বদলে দেয় যে, সবটা তার নিজের নিয়ন্ত্রণেও থাকে না। তা ছাড়াও তমাল ওর চাকরির অভিজ্ঞতার সুবাদে দেখেছে, চাপে পড়ে মানুষ কী না করতে বাধ্য হয়। খুব বেশিদিন তো আর মেঘনাকে

কাছ থেকে দেখেনি তমাল। তা ছাড়াও ওর এখনকার অবস্থা, জীবনযাত্রা সম্পর্কে তো কোনও ধারণাই নেই তমালের। সেই কোন যুগের কথা, আইএসসির রেজাল্ট বেরোনোর পরই ওর অনিচ্ছে সত্ত্বেও বাবা দিল্লিতে পড়তে পাঠিয়ে দিলেন। এই প্রথম ওরকম একটা বড় শহরে একা থাকা, কলেজের পড়া, সেই সঙ্গে সর্বভারতীয় পরীক্ষার প্রস্তুতি, সবকিছু নিয়ে হিমসিম খেতে খেতে তখন কোথায় মেঘনা, কোথায় কে! আর মোবাইল তো সেদিনের কথা। মোবাইলের কথায় মনে পড়ে গেল মেঘনার প্রথম ফোন। এক ধাক্কায় ঘড়ির কাঁটা পেছন দিকে বনবন করে ঘুরতে ঘুরতে পিছিয়ে গেল প্রায় আঠেরো উনিশ বছর।

সেদিন স্যারের বাড়ি থেকে ফেরার সময়ের ঘটনার পর থেকে তমাল, মেঘনা দুজনের মধ্যেই একটা পরিবর্তন এসেছে। স্কুলে দেখা হয়, একটু হাসি বিনিময়, কিন্তু কথা হয় না। খালি ভয় করে, কথা বললে সবাই যদি কিছু সন্দেহ করে! অথচ এইসময় ক্লাসের অনেকেই প্রেম করছে। তাদের প্রেমের গল্প রসিয়ে রসিয়ে সবাইকে বলছে, সবাই বেশ মজাও পাচ্ছে। হাসি ঠাট্টা চলছে সেই নিয়ে। কিন্তু তমাল, মেঘনা দুজনেরই ভাবমূর্তি স্কুলে একেবারেই অন্যরকম। ওরা পড়াশোনায় ভালো, সিরিয়াস প্রকৃতির ছেলেমেয়ে। সবার সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথা আলোচনা করার মতো লঘু চিন্তা মাথাতেই আসে না। শুধু একটু চোখের দেখা, তাতেই কতখানি পাওয়া যায়, দৃষ্টি দিয়েও ছুঁয়ে দেওয়া যায়, এই প্রথম এরকম অনুভূতির স্বাদ পাচ্ছে ওরা। একবার চোখাচোখি হলেই যেন সমস্ত শরীর জুড়ে জোড়ঝালা বেজে ওঠে। কে বাজায়, কাকে বাজায় তা তো বোঝা যায় না।

একদিনের বৃষ্টি দুটো মানুষকে নিয়ে এক অলৌকিক খেলা শুরু করে দিল। মন তো আবহাওয়ার মতোই, কোনও বিধিনিষেধ মানে না। সেবার পুজোর ছুটিতে দেশের বাড়ি যাওয়ার কথা

মেঘনাকে বলার কোনও সুযোগই পায়নি তমাল। তা ছাড়াও পরীক্ষা শেষের দিনে মেঘনাকে ঘিরে ছিল ওর বন্ধুরা। এই প্রথম বেড়াতে যাওয়ার নামে তমালের উৎসাহে ভাটা পড়ল। অথচ ওই দেশের বাড়ি, ঠাম্মির আদর সবকিছুর জন্য এতদিন তমাল মুখিয়ে থাকত। এবার ওখানে গিয়েও কেমন একা একা ঘুরে বেড়ালো। ছোটোকাকু কতবার বললেন মাছ ধরতে যাওয়ার কথা, কোচবিহার রাজবাড়ির পুজো দেখতে যাওয়ার কথা, কিছুতেই তমালের মন নেই। যদি আসার আগে একবার মেঘনার সঙ্গে দেখা হত। যদি একটু আড়ালে বসে কথা হত। মনকেমন করার এক অসুখ এমনিতেই এই কিশোর বয়েসটাকে ঘিরে রাখে, তার ওপর এই দীর্ঘ অদর্শনের পালা ওকে বিষণ্নতার এক শামুকখোলের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে। কেউ কথা বললে টুকরো টাকরা কথায় জবাব দেয়, কখনও চুপ করে থাকে, একা একা সাইকেল নিয়ে ফরেস্টের দিকে ঘুরতে চলে যায়। লম্বা সময় বসে থাকে খিড়কির পুকুরের ধারে। মা ভাবেন ছেলে বড় হচ্ছে, পিউবার্টির সময়কার পরিবর্তন। আহা, এই সময় যদি মোবাইল থাকত। কিছুই ছিল না প্রায় সেই যুগে, যোগাযোগের মাধ্যম শুধু চিঠি। কিন্তু চিঠি লিখবে কী করে, ঠিকানাই জানে না। আর যদিও বা জানত, তাহলেও কোন ভরসায় লিখত, যদি মেঘনার বাবা-মার হাতে গিয়ে পড়ে সেই চিঠি! একসময় ছুটি ফুরোল। ওরাও কলকাতায় ফিরে এল। সেদিনই, দুপুরে মা ঘুমোচ্ছেন, এমন সময় ল্যান্ডলাইনের সেই আদ্যিকালের কালো টেলিফোন বেজে উঠল। তমাল স্বাভাবিকভাবে ফোন ধরে হ্যালো বলতেই, এতদিন কোথায় ছিলিস? একটা ভিজে গলার স্বর।

তমালের মনে হয়, ও যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। রিসিভার ধরা হাতের আঙুলগুলো থরথর করে কাঁপছে, সমস্ত শরীরই কাঁপছে, ফুটছে উত্তেজনায়, আবেগে।

তুই আমার বাড়ির নাম্বার কোত্থেকে পেলি?

কোত্থেকে পেলাম, তা জেনে তুই কী করবি! তুই তো আর দিসনি। উলটে আমাকে কিছুই না জানিয়ে এতদিনের জন্য উধাও হয়ে গেলি। রোজ ফোন করছি, বেজে বেজে থেমে যাচ্ছে। আমার কথা তুই একটুও ভাবিস না, না?

ওপারে গলার স্বর কান্নায় দ্রব হয়ে এসেছে, প্রথমদিকের ঝাঁজ কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে।

মায়ের ঘরের দিকে একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে তমাল বলে,

শোন তোকে অনেক কথা বলার আছে, কাল স্যারের বাড়ির নাম করে একবার বেরোতে পারবি? স্কুল খুলতে খুলতে তো এখনও তিন চার দিন। তুই লেকের দিকে চলে আয় চারটের সময়।

প্রথমে কিন্তু কিন্তু করলেও, মেঘনা শেষ অব্দি রাজি হয়ে যায়। পড়াশোনার বৃত্তের বাইরে এই প্রথম এভাবে দেখা। হলুদ সালোয়ার কামিজে মেঘনাকে একটা সোনাঝুরি গাছের মতো লাগছে। ভয় উত্তেজনা রোমাঞ্চ সব মিলিয়ে দুজনেরই মুখে ঈষৎ লালের ছটা। কেউ কথা বলতে পারছে না। অনেক সময় নীরবতা কথার চাইতে অনেক বেশি বলে দেয়। ওরা জলের কাছাকাছি একটা বেঞ্চে গিয়ে বসে। গরমের সেই তীব্রতা আর নেই। অক্টোবর মাস। হালকা হাওয়া দিচ্ছে। লেকের জলে ছোট্ট ছোট্ট ঢেউ, ঢেউ ওদের ভেতরেও। সেই ঢেউ আরও প্রবল, লেকের জলের মতো জীবন তো কোনও সীমারেখা দিয়ে ঘেরা নয়, তাই সেখানে ঢেউ সমুদ্রের মতো উত্তাল, তীব্র। প্রথম তরঙ্গ এসে লেগেছে ওদের ছোট্ট নৌকায়, সাধ্য কী তাকে ঠিকমতো সামাল দেয়! নৈঃশব্দ্য ভেঙে মেঘনাই প্রথম কথা বলে, এবার বল...

নাহ,

বল, কী জন্য জরুরি তলব?

আসলে তোকে এতদিন দেখিনি, তাই, তমাল আমতা আমতা করে।

সেটা তোর দোষ।

আমরা প্রতিবছরই পুজোর ছুটিতে রাজাভাতখাওয়ায় আমাদের দেশের বাড়িতে যাই। তোকে বলব কী করে, তুই তো সবসময় বন্ধুদের সঙ্গে।

তুই একবার ইশারা করতে পারতিস...

পরস্পরকে দোষারোপের পালা চলে। চলতেই থাকত, যদি এই সময় তমাল সাহস করে মেঘনার হাতের ওপর নিজের হাতটা না রাখত। এই প্রথম নিজের অধিকারে নিজের মতো করে পাওয়া। হোক না, সে শুধু হাত ধরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, দুজন কিশোর কিশোরির কাছে সেই তো পরম পাওয়া। মেঘনার কথা বন্ধ হয়ে যায়। এই স্পর্শটুকু শুষে নিতে থাকে। হঠাৎ করেই মনে হয়, ওদেরও যদি ওরকম হয়, 'ন হন্যতে'র মির্চার মতো তমালকেও যদি অনেক দূরে চলে যেতে হয়! বিষাদ বড়ো সংক্রামক। কে যেন একটা কালিমাখা কাপড় দিয়ে ওদের ঝকঝকে সাদা পৃষ্ঠাটা ভিজিয়ে দেয়। কোনও কারণ ছাড়াই মেঘনা ফুঁপিয়ে ওঠে। টসটস করে জল গড়িয়ে পড়ে ওর কমলালেবুর মতো মসৃণ গাল বেয়ে। তমাল আঙুল দিয়ে তুলে নেয় একটা একটা করে স্ফটিকের দানা,

আমাকে ছেড়ে কোনোদিন চলে যাবি না, কথা দে...

স্যার, এইমাত্র গ্যাংটক থেকে ফোন এসেছিল, ওরা বলছে, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আজকে ওরা মেইল করতে পারবে না। আমি বলেছিলাম না, আসতে দেরি হবে। এই চাকরিতে আমার তিরিশ বছর হয়ে গেল স্যার। দেখে দেখে চোখ পচে গেছে, এইসব কেসে অনেক লফড়া থাকে। খুব তাড়াতাড়ি হলে কাল বিকেল নাগাদ পাঠাবে, গুরুং-এর কথায় তমাল এক ঝটকায় সিধে হয়ে দাঁড়ায়। জোর করে মনসংযোগ করার চেষ্টা করে। মেঘনা সান্যাল আপাতত তার সন্দেহের তালিকায় থাকা একজন মানুষ। এই মুহূর্তে সে একজন তদন্তকারী অফিসার। এসব তুচ্ছ আবেগকে তার একদমই পাত্তা দেওয়া উচিত না। তমাল অহেতুক জোরের সঙ্গে হাঁক দেয়, মিস্টার

গুরুং, ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টকে এক্ষুনি একবার ফোনে ধরুন। সব কাজে এত দেরি হচ্ছে কেন? লামার গায়ে যেসব ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে সেগুলো ডিটেক্ট করতে পারলেই আমাদের ইনভেস্টিগেশন অনেকদূর এগিয়ে যাবে।

ঠিক এই সময়েই গুরুং-এর ফোন বেজে ওঠে। ফোন ধরে গুরুং আঁতকে ওঠে, স্যার ওই সুদীপ্ত মালটা পালিয়েছে। আমি আগেই বলেছিলাম ওকে লকআপে রাখতে।

শাট আপ! আপনাকে বলা হয়েছিল সুদীপ্তকে চোখে চোখে রাখার জন্য দুজন প্লেন ড্রেসের পুলিশ লাগিয়ে দিতে, এখন বলছেন পালিয়েছে, যত্ত সব অপদার্থের দল, কী করে যে এতদিন চাকরি করছেন! আপনাদের মতো লোকেদের জন্যই পুলিশের এত বদনাম। তমালের মুখচোখ রাগে ফেটে পড়ে, সুদীপ্তর ফোনেরও লোকেশন ট্রেস করতে বলে দিন। আর কুশলকে একবার থানায় ডেকে পাঠান। যাবে কোথায়, ওর আই-কার্ড তো আমাদের কাছেই জমা। দেখুন সেসবও আবার জালি নাকি।

না স্যার, আমি লাটাগুড়ি থানা থেকে খবর নিয়েছি। মালটা আসলি, গুরুং মাথা নিচু করে বলে। এই বাচ্চা ছেলেটার কাছে ধমক খেতে হচ্ছে, গুরুংএর মাথা গরম হয়ে যায়। কিন্তু বস বলে কথা, টেরিবেরি করলে দেবে আরও কোনও দুর্গম জায়গায় বদলি করে। শেষ জীবনটায় আর শান্তি নেই। একে তো মানখিমের মতো ছোট্ট গ্রামে বাঁ হাতের রোজগার প্রায় নেই বললেই চলে, ওই মাঝেমধ্যে খুচরো খাচরা কিছু স্মাগলিংএর কেস এলে তবে কটা পয়সা পকেটে ঢোকে। গুরুং দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

৪

রাস্তাঘাট পুরো শুনশান। দু-ধারের পাইনগাছগুলোর মাথা হালকা হাওয়ায় দুলছে, তার ছায়া রাস্তায় পড়ে এক অদ্ভুত আলোআঁধারির চলচ্চিত্র। পুরোনো দিনের হরর মুভির কথা মনে পড়ে যায়। একটু শিউরে ওঠে। তাড়াতাড়ি পা চালায় মেঘনা। এতটা রাত হয়ে যাবে ভাবতেই পারেনি। তা ছাড়াও সবকিছু কি আর আগের থেকে অত ভেবেচিন্তে রাখা যায়! ছবির সিরিজটা যে এভাবে ক্লিক করে যাবে সেটাও কি কস্মিনকালে ভেবেছিল! তবে এটাও সত্যি, একটা আত্মবিশ্বাস ছিল, আস্থা ছিল নিজের কাজের প্রতি। কিন্তু, এতটা সাফল্য পাবে, সেটা ওর কল্পনাতেও ছিল না। আজকের প্রদর্শনীতে প্যারিসের শিল্পী আর সমালোচকদের ভিড় ওকে চমকে দিয়েছে। অবশ্য সাবজেক্টটা এত আনকমন না হলে কতদূর কী হত বলা কঠিন। যে মাপের সব কাজ ও আজ দেখতে পেল, জাস্ট ভাবাই যায় না। এর ভেতর ভারতের প্রায় একজন নভিশ শিল্পীর ছবির জায়গা করে নিতে পারাই একটা বিশাল প্রাপ্তি। তার ওপর ওদের ছবির রং থেকে শুরু করে সারফেসের মেটেরিয়াল সবই কত উন্নত মানের। বাইরে বেশ ঠান্ডা। মেঘনা জ্যাকেটের হুডটা তুলে দেয়। মোবাইল বের করে দেখে বারোটা বেজে গেছে। কিন্তু প্যারিসের রাস্তা এই বারোটাতেই এত ফাঁকা! দোকানপাট সব বন্ধ, এমনকি পাবগুলোও। অথচ ও সারাজীবন ধরে কত কী গল্প শুনে এসেছে প্যারিসের নৈশ-জীবন সম্পর্কে। কেমন

একটা খটকা লাগে। আরও তাড়াতাড়ি পা চালায়। হতেও তো পারে, এটা কোনও গন্ডগোলের ইঙ্গিত। এই তো কদিন আগেই একটা সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণ হয়ে গেল এই ফ্রান্সের বুকেই। কেমন একটা থম মারা পরিবেশ, যেটা একেবারেই স্বাভাবিক নয় শিল্প-সাহিত্যের তীর্থভূমি এই নগরীতে। স্ট্রিট লাইটগুলো কুয়াশায় ভিজে আছে। এই আলোর কোনও জ্যোতি নেই। ঝুঁঝকো আলোআঁধারির ভেতর হঠাৎ করে কিছু লোকের উঁচু গলার কথাবার্তা শোনা যায়, যেন ঝগড়া করছে। এতক্ষণ চারিদিক থম মেরে ছিল, সেও একরকম ভালো ছিল। এবার ভয় পেয়ে যায় মেঘনা। একে এই অচেনা শহর, তার ওপর একা। কী হল ব্যাপারটা! একসঙ্গে অনেক মানুষের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। যেন দৌড়ে আসছে, তাড়া করে আসছে পেছন থেকে। মেঘনা ঘুরে দাঁড়ায়। অচিরেই চোখে পড়ে বিশাল একটা কালো পিণ্ডের মতো কিছু যেন ভীষণ গতিতে ওর দিকে ছুটে আসছে। মনে হচ্ছে যেন আস্ত একটা পাহাড় জ্যান্ত হয়ে দৌড়ে আসছে ওকে পিষে দেবে বলে। মেঘনা এবার দৌড়োতে শুরু করে। প্রচণ্ড একটা ভয় ওকে চেপে ধরে, গা হাত পা থরথর করে কাঁপছে, এই শীতেও টপটপ করে ঘাম ঝরতে থাকে। পা যেন আর চলছে না। পিণ্ডটা আরও এগিয়ে এসেছে। মেঘনা প্রাণপণে দৌড়োতে থাকে। আর পারা যাচ্ছে না, ওদের গতিবেগ অনেক বেশি, ওকে ছুঁয়ে ফেলল বলে। এবার স্পষ্ট দেখা যায়, কতগুলো মানুষ, কালো লাল চকরা বকরা পোশাক, একটা টর্নেডোর মতো ধেয়ে আসছে ওর দিকে। কে যেন ওর দুটো পা মাটির ভেতর গেঁথে দিয়েছে। মেঘনা নড়তে চড়তেও ভুলে গেছে। ঝড়টা শেষ অব্দি আছড়ে পড়ল। এক ধাক্কায় শুইয়ে দিল মাটিতে। কম করে আট দশজন পুরুষ একসঙ্গে ওর ওপর হামলে পড়েছে। দাঁত নখ নিয়ে আক্রমণ করেছে কয়েকটা হিংস্র শ্বাপদ। ওরা কী এক আক্রোশে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলছে ওকে। কারোরই মুখ দেখা যাচ্ছে না। ডোরাকাটা মুখোশগুলোর থেকে

কাউকে আর আলাদা করে চেনাও যাচ্ছে না। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে মেঘনা। একদম প্রাণে মেরে না ফেলা অব্দি ওরা আর রেহাই দেবে না। ওদের কথা স্পষ্ট বুঝতে পারে না মেঘনা, চারিদিক কাঁপিয়ে কেবল একটাই শব্দ শোনা যাচ্ছে, কেন কেন কেন কেন... শুধু কেন-র একটা ঢেউ আছড়ে পড়তে থাকে মেঘনার ওপর। আমাকে বাঁচাও, বলে চিৎকার করে উঠতে চায়, কিন্তু গলা দিয়ে কোনও স্বর বেরোয় না।

ধড়মড় করে উঠে বসে মেঘনা। এরা কারা, কারা ওর শরীরটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলতে চাইছিল? মানুষের মতো দেখতে হলেও, ওরা তো মানুষ নয়। ওরা চরিত্র। যে চরিত্রগুলোর সঙ্গে গত কয়েক মাস ধরেই বসবাস করছে মেঘনা। ওরা আসলে ওর ছবির উপাদান। যেদিন থেকে ঠিক করেছে, উত্তরবঙ্গের এই লোকদেবতাদের নিয়ে ছবির সিরিজ করবে, সেদিন থেকেই আস্তে আস্তে মেঘনার জীবনযাপনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে এই চরিত্রগুলো। কিন্তু এ কোথায় এসে পড়ল! কিছুই মালুম হচ্ছে না। এ তো প্যারিস নয়। তার মানে এতক্ষণ ধরে স্বপ্ন দেখছিল! ঠিক যেভাবে সমাজের পেটের ভেতর লুকিয়ে বসে থেকে কিছু রোগ-ব্যাধি সমাজকে ধীরে ধীরে ক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, আর বিপন্ন অসহায় মানুষ বারবার আশ্রয় খুঁজেছে দেবতার কাছে, লোকবিশ্বাসের কাছে, ঠিক তেমনই ওর স্বপ্নের ভেতরেও ভর করেছে সমাজের সেই বিষাক্ত শ্বাপদের দল, যেন একটা ধারালো ছুরি দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটছে ওর আশা-আকাঙ্ক্ষার কোলাজটাকে। কিন্তু, ও কোথায় আশ্রয় নেবে, কে ওর দিকে বাড়িয়ে দেবে আশ্বাসের হাত! তাহলে কি মেঘনা ভুল করেছে এই সিরিজটা শুরু করে? নইলে এরকম বাধা আসবেই বা কেন! মা পইপই করে বারণ করেছিলেন, বারবার বলেছিলেন এত বিষয় থাকতে ঠাকুরদেবতা নিয়ে ছবি আঁকা কেন বাপু, আর যদি আঁকতেই হয়, যামিনী রায়ের মতো বা মধুবনী পেন্টিংএর স্টাইলে আঁকলেই হয়। আর ও

তখন পাগলের মতো মাশানের মূর্তির অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্ম খুঁজে গেছে। পাত্তাই দেয়নি মায়ের কথায়। আজ এই ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে ঘরে এভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছে, মার কথাই ঠিক। ওর মুক্তি নেই, সমাজের যে ক্ষতগুলোকে ও তুলে ধরতে চেয়েছিল তার ক্যানভাসে, সেই ক্ষতগুলোর থেকে আজ পিলপিল করে বেরিয়ে আসছে মারণরোগের ভাইরাস আর ব্যাক্টেরিয়া। ওরা সত্যি সত্যিই ওকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলবে।

ভাবতে ভাবতেই আবারও চোখ জড়িয়ে আসে। ঘুম, শুধু ঘুম চাইছে এখন শরীর। তা সত্ত্বেও জোর করেই চোখ খুলল। উঠে বসতে গিয়ে দেখে হাত পা বাঁধা। মুখও এঁটে বেঁধে রাখা। একটা কাঠের ঘর, ছোটো। তক্তার ফাঁক দিয়ে দিনের আলো আসছে। আবছা আবছা কিছু ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একটা বাক্স, বাক্সভর্তি মাশানের পট। সুড়ঙ্গের ভেতর কী অন্ধকার! অন্ধকার এখন মেঘনার জীবনেও। ওহ, একটু জল খেতে পারলে বড়ো ভালো হত। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, যেন কতদিন একফোঁটাও জল খায়নি। কোথায় এসে পড়ল কিছুই বুঝতে পারছে না। কতদিন ধরে এই ছোট্ট কুঠরিতে বন্দি হয়ে আছে মনেই করতে পারছে না। মেঘনা নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। কিছুটা সময় লাগে, কিন্তু আস্তে আস্তে সব ঘটনাই পরপর মনে পড়ে যেতে থাকে। এক ধাক্কায় উলটোমুখে ঘুরে যায় সময়।

সেদিন ঘুম ভাঙতে বেশ বেলা হয়ে গেছে, আগের রাতে প্রায় তিনটে অব্দি কাজ করেছে। কিছুতেই সিরিজটাকে দাঁড় করাতে পারছে না। শেষে বিরক্ত বিধ্বস্ত শরীর মন নিয়ে স্টুডিওর মেঝেতেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙতেই তড়িঘড়ি চায়ের কাপ নিয়ে মেঝেতেই থেবড়ে বসে। দিনটা অন্য কারণেও স্পেশাল ছিল, সেদিন কমলেশদার ছবির একজিবিশনের উদ্বোধন সিমা আর্ট গ্যালারিতে। কমলেশদা ওর প্রিয় শিক্ষক। ওঁর জন্যই মেঘনা

এই জগতে এতখানি ঢুকতে পেরেছে। ছবি যতই অ্যাবস্ট্রাক্ট ধরনের দিকে চলে যাক না কেন, সমাজ বা প্রকৃতিকে অস্বীকার করে কোনও সৃষ্টিই হয় না, কমলেশদা বলতেন, শুধু মানুষের ফিগার নয়, ক্যারেক্টারকেও স্টাডি করো। নাহলে নিখুঁত ছবি হবে, কিন্তু রিয়্যালিস্টিক হবে না। আর রিয়্যালিস্টিক কাজ ঠিকমতো না শিখলে, কোনোদিনই অ্যাবস্ট্রাকশনের দিকে যেতে পারবে না। গোঁজামিল দিয়ে আর যাই হোক, ছবি হয় না। এই কথাগুলো নিজের ভেতরে গেঁথে নিতে নিতে, একসময় বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। মেঘনা তাই চলতে ফিরতে যে মানুষেরই সান্নিধ্যে আসে, তাকে বোঝার চেষ্টা করে, তার হাবভাব, অঙ্গভঙ্গি, মুদ্রাদোষ সবকিছু খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে, তার প্রতিটা আচরণকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করে। শুধু এবারেই মনে হচ্ছে পায়ের তলায় একটা শক্ত জমি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না। কাজটা কোনোভাবেই উতরাচ্ছে না। উত্তরবঙ্গের মাশানদেবতা নিয়ে এই সিরিজটা করতে গিয়ে অন্তত দু-বার কলকাতা শিলিগুড়ি দৌড়েছে, সুদীপ্ত কয়েকরকম শোলার মাশানের মূর্তি সংগ্রহ করে দিয়েছে, কিন্তু কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকেই যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এভাবে হবে না। আরও ভেতরে ঢুকতে হবে, লোক-সংস্কৃতির কোষ-কলা থেকে শুরু করে নিউক্লিওলাস অব্দি ঢুকতে না পারলে এই সিরিজ করা যাবে না। ফিল্ডওয়ার্ক করতে হবে। ঢুকে পড়তে হবে ওখানকার মানুষজনের জীবনযাত্রার ভেতর, অনুভব করতে হবে তাদের সমাজ সংস্কৃতিকে, অনুভব করতে হবে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই পরম্পরাকে।

সম্বল বলতে একমাত্র জেদ আর আত্মপ্রত্যয়। ওর পঁয়ত্রিশ বছরের জীবন মেঘনাকে এই শিক্ষাই দিয়েছে, এই দুটো জিনিস থাকলে যে কোনও লড়াই জেতা যায়। আইএসসিতে ভালো নম্বর নিয়ে পাস করেও সায়েন্স নিয়ে না পড়ে জেদ করে ভরতি হয়েছিল কলাভবনে, ফাইনআর্টস নিয়ে। বাবার তীব্র

আপত্তি ছিল। আজ অব্দি এই বংশে কেউই চিত্রকলা নিয়ে কাজ করেনি, তার ওপর এসব শাখায় প্রতিষ্ঠা পেতে পেতে জীবন কাবার হয়ে যায়। সারাজীবন তরুণ শিল্পীর তকমা নিয়ে বেঁচে থাকতে থাকতে একসময় না একসময় অবসাদ আসতে বাধ্য। আর এই হতাশা কত শিল্পীকে যে আত্মধ্বংসী করে তুলেছে তার উদাহরণ ভূরি ভূরি। কিন্তু মেঘনার যা স্বভাব, একবার কিছু একটা করবে ভাবলে, সেটার শেষ না দেখা অব্দি কোনও বাধাই ওর কাছে বাধা নয়। অবশ্য সেখানেও সাফল্য এনে দিল কাজের প্রতি ওর নিষ্ঠা আর হয়তো জন্মগত প্রতিভা। বাড়ির সবাইকে চমকে দিয়ে একেবারে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। আসলে জীবনে যে কাজটাই করে, নিজের সম্পূর্ণটা দিয়েই করে মেঘনা। সে ছবি আঁকাই হোক বা ঘরের সামান্য কোনও কাজ বা মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক, কোনোকিছুতেই ফাঁকি দেওয়া ওর ধাতে নেই। কিন্তু ফাইনআর্টসে ডিগ্রি নেওয়ার পর মেঘনা বুঝতে পারে শুধু ছবি এঁকে পেট ভরবে না। তাও আবার ওর মতো একজন পেডিগ্রিহীন প্রথম প্রজন্মের শিল্পীর পক্ষে তো সম্ভবই নয়। অনেক লম্বা পথ হাঁটতে হবে, প্রচুর সংগ্রাম করে তবে একটা জায়গায় পৌঁছোতে পারবে। এমনিতেই ছবি আঁকার সরঞ্জামের দাম আকাশছোঁয়া। বাবা এতদিন টানলেন। তা ছাড়াও, নিজের জেদে এই বিষয় নিয়ে পড়েছে, এখন নিজস্ব উপার্জনের একটা ব্যবস্থা করা ওর কাছে একটা চ্যালেঞ্জের মতো ছিল। ফলে চাকরি একটা নিতেই হল, একটা বিজ্ঞাপন সংস্থায়। কয়েক বছর কাজ করার পর, সেই কোম্পানিরই একজন সিনিয়ারের সঙ্গে প্রেম এবং বিয়ে। প্রথম প্রথম সব ঠিকই ছিল, তারপর ধীরে ধীরে স্বামীর আসল চেহারা প্রকাশ পায়। প্রকৃতেশ ছিল একই সঙ্গে দাম্ভিক আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী। ও একেবারেই মেনে নিতে পারত না মেঘনার শিল্পীসত্তাকে। ওর কাছে ছবি আঁকা কোনও প্রাণের আবেগের ব্যাপার নয়, প্রচুর উপার্জনের মাধ্যমমাত্র। এদিকে মেঘনা

বাপ মায়ের একমাত্র সন্তান। সারাজীবন যা চেয়েছে তাই পেয়েছে। ছবিই ওর প্রথম ভালোবাসা। ইচ্ছে ছিল কিছুদিন চাকরি করে পয়সা জমিয়ে প্যারিসে যাবে, বড়ো কোনও শিল্পীর অধীনে শিক্ষানবিশ হয়ে ছবির আধুনিক কলাকৌশলগুলো রপ্ত করার চেষ্টা করবে। এখানেই প্রকৃতেশের আপত্তি। ওর কাছে মেঘনার ইচ্ছে অনিচ্ছের কোনও মূল্যই ছিল না। মেঘনা আর প্রকৃতেশ মিলে যা মাইনেপত্র পেত, সেটা দুজনের সংসারের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্ত, কিছু কিছু মানুষ আছে, যাদের চাহিদার কোনও সীমা পরিসীমা নেই। প্রকৃতেশ মানুষটাও এই গোত্রেরই। প্রমোশনের জন্য যেকোনো অনৈতিক কাজ করতেও ও দুবার ভাবত না। মেঘনাকেও জোর করত একই পথে হাঁটতে। এমনকি নিজের স্বার্থে মেঘনার সৌন্দর্য্যকে ব্যবহার করতেও প্রকৃতেশের কোনও সংকোচ ছিল না, বরং অফিসের পার্টিতে বসের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করার জন্য ও মেঘনার ওপর চাপ দিতে শুরু করে। ক্রমে এই বিবাদ চূড়ান্তে পৌঁছল। তাও শুধু ঝগড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে মেঘনা হয়তো প্যারিসে না যাওয়া অব্দি দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে সম্পর্কটা টেনে নিয়ে যেত। কিন্তু প্রকৃতেশ শেষ অব্দি যখন গায়ে হাত তুলতে শুরু করল সেদিন থেকেই মেঘনারও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। সারাজীবনে কোনও কিছুর সঙ্গে আপোষ না করা মেঘনার একে তো এই ধরনের অনৈতিক কাজে তীব্র ঘৃণাবোধ হত, তার ওপর প্রকৃতেশের এই লোলুপ স্বভাব ওদের মধ্যে দূরত্ব বাড়াতে বাড়াতে সম্পর্কটাকে একেবারে তলানিতে নিয়ে ফেলেছিল। যেদিন বসের সঙ্গে শুতে রাজি না হওয়ায় প্রকৃতেশ ওকে মেরে ঠোঁট ফাটিয়ে দিল, মেঘনা আর থাকতে পারেনি। সেদিনই নিজের বাক্সপ্যাটরা নিয়ে সোজা একটা ওয়ার্কিং গার্লস হস্টেলে এসে ওঠে। ক-দিন পর টের পেয়ে বাবা-মা অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পর সেখানেও বেশিদিন থাকেনি। চাকরি করে যা কিছু

টাকা জমেছিল, তাই দিয়ে এক-কামরার একটা ফ্ল্যাট বুক করে ফেলে। ছ-মাসের মাথায় ফ্ল্যাটের পজেশন পেয়ে যেতেই সেখানে গিয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে প্রকৃতেশকে উকিলের নোটিশ পাঠানো হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতেশ কিছুতেই ডিভোর্স দিচ্ছে না। উলটে মাঝে মাঝেই ফোন করে শাসায় কেস তুলে নেওয়ার জন্য। প্রকৃতেশের হাতযশে শেষ অব্দি চাকরিটাও গেছে। এখন ফ্রিলান্স কাজকর্ম করে ওর একার দিব্যি চলে যায়। তা ছাড়াও আজকাল প্রদর্শনীতেও মোটামুটি একটা দাম পায় ওর ছবি। তবে এত অল্পে সন্তুষ্ট নয় মেঘনা, তার শেখার খিদে অপরিসীম। তাই জীবনের এত ঝড়ঝাপটার পরেও প্যারিসের স্বপ্ন কিছুতেই মেঘনার মন থেকে মুছে যায় না।

এতদিনে সে সুযোগও এসেছে। শহরের এক বিখ্যাত আর্ট গ্যালারি একটা প্রতিযোগিতার কথা ঘোষণা করেছে, যাতে প্রথম হলে ওদের প্যারিসের শাখায় সেই প্রতিযোগীর কাজ প্রদর্শিত হবে, সেই সঙ্গে শিল্পীকেও স্কলারশিপ দিয়ে সেখানে কাজ শিখতে পাঠানো হবে। মেঘনা তো শুনেই লাফাতে শুরু করেছে। বাবাও বললেন, সুযোগ কিন্তু বারবার আসে না। এত জেদ করে যখন আর্ট নিয়ে পড়াশোনা করলে, এটাকে কাজে লাগাও।

আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি বাবা। মাশানের এই সিরিজটা করে ফেলতে পারলে, আমাকে আর কেউ আটকাতে পারবে না। এটা একদম আনকমন সাবজেক্ট। আজ অবদি ফোক-আর্ট নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে, কিন্তু মাশান নিয়ে কাজ প্রথম আমিই করছি।

কয়েক মাস আগের কথা, লোকসংস্কৃতির একটা পত্রিকার পাতা ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎ করেই একটা পাতায় কিছু ছবি দেখে চোখ আটকে গিয়েছিল। তারপরই শুধু ছবি নয়, গোটা প্রবন্ধটাই প্রায় এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলেছিল মেঘনা। প্রবন্ধের নাম, “মাশান— এক পরম্পরাগত লোকদেবতা”, লেখক

কল্লোল বিশ্বাস। তারপর বেশ ক-দিন ধরে ওকে ভাবাতে থাকে এই বিষয়টা। এমনিতেই ও অপ্রচলিত কোনও বিষয় নিয়ে কাজ করার কথা ভাবছিল। যদিও জানত, ফোক-আর্টের বিভিন্ন শাখা, যেমন বাংলার পটচিত্র, মধুবনি, রাজস্থানি পেইন্টিং এসবই বহুদিন ধরে ছবির উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, সে তুমি মেইনস্ট্রিমই বলো আর অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্মই বলো। তবুও এমন কোনও লোকশিল্প নিশ্চয় আছে, যা এখনও বহু ব্যবহারে ছিবড়ে হয়ে যায়নি। সেরকম ফোক-আর্টের ওপর কাজটা করতে পারলে গতানুগতিক ছক ভাঙা যাবে, বিশেষ করে প্রবন্ধটা পড়ে আর ছবিগুলো দেখে ও বুঝতে পারে, মাশান এমন একটা লোকবিশ্বাস, যা নিয়ে এর আগে ছবির ক্ষেত্রে কোনও কাজ হয়েছে বলে অন্তত ওর জানা নেই। ব্যাপারটা মাথায় ঢুকতেই ভেতরে ভেতরে টগবগ করে ফুটতে থাকে মেঘনা। এমনকি ডায়াল দেখে ভদ্রলোকের ফোন নম্বরও জোগাড় করে ফেলে। তারপর ফোন করবে কি করবে না ভাবতে ভাবতে একদিন ঝোঁকের বশে ফোনটা করেই ফেলে। রিং হচ্ছে আর মেঘনা ভাবছে, ঠিকমতো কথা বলবেন তো ভদ্রলোক, যদি এক কথায় হাঁকিয়ে দেন! এইসব গবেষকরা কেউ কেউ খুব মুডি হন, দুর্ব্যবহারও করেন। এরকম অভিজ্ঞতা আগেও কয়েকবার হয়েছে।

কিন্তু, এবারের অভিজ্ঞতা আগের সঙ্গে তো মিললই না, বরং আমূল নাড়িয়ে দিল মেঘনার সম্পূর্ণ সত্তাকে। কয়েকবার রিং হওয়ার পর ভদ্রলোক নিজেই ফোনটা ধরলেন, আর ওঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে কখন যে মেঘনার যাবতীয় জড়তা কেটে গেল, মেঘনা নিজেই খেয়াল করতে পারল না।

জানো তো মাশান উত্তরবঙ্গ তথা অসমের এক লোকদেবতা, মেঘনার ফোন করার উদ্দেশ্য শোনার পর কল্লোল বিশ্বাস আর বিশেষ সময় নষ্ট না করে সরাসরি প্রসঙ্গের ভেতর ঢুকে গেলেন, আর

এখানকার মানুষের বিশ্বাস ব্যক্তি বা সমষ্টির কল্যাণ কামনা করে এঁর পুজো করলে সমাজের মঙ্গল হবে। আসলে কী জানো, তুমি যদি ইতিহাসের দিকে নজর দাও দেখবে, একসময় প্রকৃতির কাছে মানুষ কতটা অসহায় ছিল।

ইতিহাস কী বলছেন স্যার, এই যে মানুষ এত উন্নত হয়েছে, তাও কি বন্যা, খরা, ভূমিকম্প এসব বন্ধ করতে পেরেছে? মেঘনার চটজলদি উত্তর।

সেটাই তো বলছি, চিকিৎসা-বিজ্ঞান এত এগিয়ে গেছে, তবুও কি মানুষ ক্যানসার, এইডসের মতো মারণরোগের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছে? কল্লোল বিশ্বাস বলেন, প্রকৃতির নানা বিপর্যয়ের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে আদিম মানুষ একসময় প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের পুজো করা শুরু করেছিল। এভাবে জল, বায়ু, আগুন প্রভৃতির পুজোর সূচনা হয়। আবার পুরাণে বর্ণিত দেবদেবীর পুজো করা ছাড়াও ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে স্থানীয় নানা প্রতিকূল অবস্থার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তৈরি হয় এক সমান্তরাল পূজা-অর্চনার ধারা। যেমন সুন্দরবন অঞ্চলে জল এবং বিভিন্ন বন্য জন্তুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য বনবিবি ও দক্ষিণরায়ের পুজোর প্রচলন। আবার দেখো, একসময় আমাদের দেশে পক্স হলে বলা হত মায়ের দয়া। তখনও ভ্যাক্সিন আবিষ্কার হয়নি। এবারে মানুষ কী করল, সেই মায়ের দয়া থেকে বাঁচতে, দেবী শীতলার কল্পনা করে তাঁর পুজো করা শুরু করল। এখনও উত্তরবঙ্গের বিষহরার গান মনসাপুজোর এক প্রচলিত রীতি। এখনও এদেশের গ্রামেগঞ্জে সাপে কামড়ালে ডাক্তার না দেখিয়ে ওঝা ডাকা হয়। যাঁরা বনে জঙ্গলে কাজ করতে যান, ওঝা তাঁদের মন্ত্র পড়ে সর্পবন্ধন দিয়ে দেন। ওঁদের বিশ্বাস, মা মনসাকে তুষ্ট করতে পারলেই সাপ আর কিছুই করবে না। লোকবিশ্বাস যে কী অদ্ভুত, তা তুমি ওই শহরে বসে কোনোদিনই বুঝতে পারবে না। গ্রামে গ্রামে ঘুরে কাজ করতে করতে নিজেই একদিন উপলব্ধি

করবে। আর জানো তো, উত্তরবঙ্গ, বিশেষত তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চল একসময় ছিল ভয়ঙ্কর সব বন্য জন্তু, শ্বাপদ, বিপজ্জনক কীটপতঙ্গসংকুল এলাকা। ফলে এই অঞ্চলের বিভিন্ন জাতি-জনজাতিরর মানুষের মধ্যেও এইসব বিপদ-আপদের থেকে পরিত্রাণ পেতে এবং বন্যা, ধস, মহামারীর হাত থেকে রক্ষা পেতে নানা ধরনের দেবতার ভাবনা তৈরি হয়েছে। মাশানও এই ভাবনারই অন্যতম ফসল।

হ্যাঁ, আপনার প্রবন্ধে এই জায়গাটা আপনি খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন, মেঘনা বলে, আমার এক বন্ধুর বাড়িতে আমি মাশানের কিছু শোলার মূর্তি দেখেছি। একটা প্রাচীন পরম্পরাগত ব্যাপার কিন্তু এখনও রয়ে গেছে মাশানের চেহারায়।

ঠিক ধরেছ, কল্লোল বিশ্বাস মেঘনার কথায় সায় দেন, সময়ের সঙ্গে মাশানের ভাবনায় ও আকৃতিতে কিন্তু বিশেষ রূপান্তর ঘটেনি। এই সংস্কৃতি যুগ যুগ ধরে একই রকম রয়ে গেছে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের সামাজিক মূল্যবোধ। বিজ্ঞান মানুষের জীবনযাত্রা দিনে দিনে আরও উন্নত করে তুলেছে, কিন্তু তার হাত ধরেই আবার এই পৃথিবীতে এসেছে ভোগবাদের আগ্রাসী আক্রমণ। ফলে, এই মূল্যবোধ নষ্ট হতে হতে একদম তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। যেদিকে তাকাও শুধু হানাহানি, ঈর্ষা, ভাই ভাইয়ের বুকে ছুরি চালাচ্ছে। এরকম অবক্ষয়ের সময়ে এই কৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত জরুরি। আমি বেশ কিছু স্পেসিমেন সংগ্রহ করেছি। মাশান শিল্পীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে তথ্য জোগাড় করেছি। দিনে দিনে সভ্যতা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে করে এই ধরনের শিল্প, হ্যাঁ, আমি একে শিল্পই বলব, যুগ যুগ ধরে লৌকিক সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে আসছে এই মাশান। তা ছাড়াও শোলা দিয়ে যেরকম সুক্ষ্ম কাজ করেন এখানকার মালি সম্প্রদায়ের লোকেরা, তাকে শিল্প ছাড়া আর কীই বা বলা যায়, তো, এই শিল্প, এই পরম্পরা কিন্তু অচিরেই হারিয়ে যাবে।

স্যার, একটু ইন্টারাপ্ট করছি, এই যে আপনি মালি শব্দটা ব্যবহার করলেন, এরা কারা? এমনিতে তো যারা ফুলের বাগানে কাজ করে, তাদেরকেই আমরা মালি বলি। মেঘনার আর কৌতূহল চাপতে না পেরে কথার মাঝখানেই প্রশ্ন করে বসে।

আসলে শোলার কাজ করেন যাঁরা, তাঁদের এই অঞ্চলে মালি বলা হয়। তবে শোলার তৈরি মাশানের মূর্তি ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় মাটির মূর্তিও দেখা যায়। এদিকে না এলে তুমি বিষয়টা ঠিক ধরতে পারবে না, তোমার সুযোগ সুবিধামতো একবার উত্তরবঙ্গে চলে এসো। আর, এই সাবজেক্ট নিয়ে কাজ করতে হলে তোমাকে আসতেই হবে। কলকাতায় বসে শুধু বই পড়ে বা নেট দেখে তুমি সাবজেক্টের ভেতর ঢুকতেই পারবে না। আমার বাড়ি আসার আগে ফোনে একবার শুধু যোগাযোগ করে নেবে। আমি তোমাকে এই লোকদেবতার সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলব। তা ছাড়াও, উত্তরবঙ্গে তোমার মতো তরুণ শিল্পীদের কাজ করবার মতো কত যে উপাদান রয়েছে, তা আমি তোমাকে ফোনে বলে বোঝাতে পারব না। আমাদের দিন তো ফুরিয়ে এল, এখন আর ফিল্ডওয়ার্ক করার মতো শারীরিক সামর্থ্যও নেই। অথচ কত কাজ যে বাকি পড়ে আছে! তোমাদের মতো ছেলেমেয়েরা এখানকার ট্র্যাডিশনাল বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করছে শুনলে আমার আনন্দ হয়। আজকাল তো সবাই নিজের শেকড়ের কথা ভুলে শুধু যুগের হাওয়ায় তাল মিলিয়ে ছুটে চলেছে। তুমি চলে এসো। আমি তোমাকে বইপত্র এবং তথ্য দিয়ে সাহায্য করব। কল্লোল বিশ্বাসের কথায় মেঘনা উৎসাহে ফুটতে থাকে।

যাব স্যার, এদিকের কাজকর্ম একটু গুছিয়ে নিয়েই আমি আপনার কাছে যাব। আপাতত যদি আমাকে কিছু বইয়ের নাম বলেন, আমি একটু পড়াশুনো এগিয়ে রাখতে পারি।

কী যেন নাম বললে তোমার, মেঘনা? তা মেঘনা, আমি তো আগেই বললাম, শুধু বই পড়ে বা নেট সার্ফিং করে ঠিকমতো কাজ হবে না, ফাঁকি থেকে যাবে। আমি হেল্প করব ঠিকই, কিন্তু তোমাকে এক্সটেন্সিভ ফিল্ডওয়ার্ক করতে হবে। আজকাল ফাঁকিবাজি করে বাজার মাত করার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। লোক-শিল্প কিন্তু অত সহজ বিষয় নয়। সেই কোন প্রাচীনকাল থেকে এর সঙ্গে জাতি-জনজাতির যাপন-প্রণালী জড়িয়ে আছে। তাই একেবারে গ্রাসরুট লেভেলে গিয়ে কাজ না করলে দুদিনের খ্যাতি পাবে, তোমার কাজে চটক থাকবে, কিন্তু প্রাণ থাকবে না। জানো, মাশানের শিল্পীরা একসময় ভেষজ রং ব্যবহার করতেন। সেগুলো সম্পর্কে জানতে হবে। এখন খুব কম শিল্পীই আছেন, যাঁরা এই রঙের ব্যবহার জানেন।

স্যার, আমি কলাভবনে পড়ার সময় এই ভেষজ রং নিয়ে খুব সামান্য কিছু কাজকর্ম করেছি। আমাদের ক্লাসে রং তৈরি করা শেখানো হত, কিন্তু শুধু সিলেবাস-ভিত্তিক পড়াশুনো বা কাজ করে আর কতটুকু শেখা যায়! তবে রামকিঙ্কর বেইজের কাজগুলো সামনে থেকে দেখে আমার মধ্যে একটা আগ্রহ তৈরি হয় এই রংএর ব্যাপারে। আপনি যদি এমন কোনও শিল্পীর সন্ধান দেন যাঁর কাছ থেকে আমি কাজ শিখতে পারব

মেঘনাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই কল্লোল বিশ্বাস বলেন, আমি খোঁজ নিচ্ছি, তুমি নিজেই একজন পেইন্টার, তোমাকে তো আর যে সে লোকের কাছে পাঠানো যাবে না। আর একটা কথা, এই ভেষজ রং কিন্তু অঞ্চল অনুসারে ভ্যারি করে। যেমন তুমি এইমাত্র রামকিঙ্করের কথা বললে, উনি কাজ করেছেন রাঢ় বাংলায় বসে। স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার প্রাকৃতিক উপাদান আর উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকবে। এসব রং তো মাটি, পাথর, গাছের ছাল, ফুল, পাতা

থেকে তৈরি হয়। ফলে বেসিক কিছু রঙের ক্ষেত্রে উপাদান এক থাকলেও বেশিটাই আলাদা হয়ে যায়।

ঠিকই ঠিকই, মেঘনা বলে, আমি আর কতটুকুই বা জানি! আপনার হেল্প ছাড়া এই সিরিজটা আমি করতেই পারব না। আপনাকে কিন্তু আমার এই অত্যাচারটুকু সহ্য করতেই হবে।

না না, অত্যাচার কীসের! আমার বরং ভালো লাগছে তোমার আগ্রহ দেখে। শোনো একটা কাজের কথা বলি, আমার প্রবন্ধে তো পড়েছ, মাশানের ভাবনার মূল সূত্রের সঙ্গে এদেশের ইতিহাস আর বৌদ্ধ-ধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে, সে বিষয়েও পড়শুনো করতে হবে। তুমি কলকাতায় থাকো, এটা একটা বিরাট সুবিধে। লাইব্রেরিগুলোকে কাজে লাগাও। বাংলার ইতিহাস নিশ্চয় কিছুটা হলেও জানো, তুমি এক কাজ করো, এখন থেকেই তান্ত্রিক বৌদ্ধ-ধর্ম সম্পর্কে কিছু বইপত্র পড়তে শুরু করে দাও, আর সেইসঙ্গে ইতিহাসটাও ঝালিয়ে নাও। তাহলে, পরে কাজ করার সময় পুরো বিষয়টা বুঝতে অনেক সুবিধে হবে।

সেদিন ফোনে প্রায় ঘন্টাখানেক কথা হল ভদ্রলোকের সঙ্গে। এত কিছু একসঙ্গে শুনে মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। এদিকে বেলাও হয়েছে, কোনোমতে স্নান খাওয়া সেরেই মেঘনা ল্যাপটপ খুলে বসে পড়ে। কল্লোল বিশ্বাস যাই বলুন না কেন, নেট সার্ফ করে কিছু তথ্য নিশ্চয় পাওয়া যাবে। এই বুড়ো লোকগুলোর কম্পিউটারের প্রতি এখনও একটা অ্যালার্জি রয়েই গিয়েছে। মেঘনার ধারণাই সত্যি। গুগল সার্চে গিয়ে মাশান লিখতেই আরও কত কত তথ্য! উত্তেজনায় মেঘনা দাঁত দিয়ে নখ কাটতে থাকে। কী ইন্টারেস্টিং! একেবারে গল্পের মতো। গল্পের মতো বলাও ভুল, মিথ বা পুরাণ যে কোনও গল্প উপন্যাসকেও হার মানিয়ে দেয়। যদি সাবজেক্টটা ঠিকমতো ধরতে পারে, যদি সিরিজটা ঠিকমতো

নামাতে পারে, এ জীবনে আর পেছন ফিরে তাকাতে হবে না, মেঘনা ভাবে।

লোকবিশ্বাস সত্যিই এক বিচিত্র ব্যাপার, উত্তরবঙ্গ ও আসামের কিছু অঞ্চলের স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস মাশানদেবতার পুজো করলে ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণ হবে, আবার কিছু মানুষ ভাবেন, এক একজন মাশানদেবতা কুপিত হলে মানুষের একেক রকম অসুখ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়। আবার সেই জন্য সেই বিশেষ লোকদেবতার পুজো দিতে হয়। মেঘনা একটা প্রবন্ধ পড়তে গিয়ে দেখে, লোকেরা পোড়া মাছ, পাখির ডিম, চাল, দই, চিঁড়ে, ধুপ, সিঁদুর, শুয়োর, পায়রা উৎসর্গ করে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে নিদির্ষ্ট মাশানদেবতার পুজো করে। একজন গবেষক লিখেছেন, মাশানের পুজো সাধারণত জৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহের শনি বা মঙ্গলবারে মেলা বসানোর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। মাসের প্রথম সপ্তাহের শনি বা মঙ্গলবারে মাটির ঘট বসানোর মধ্যে দিয়ে শুরু হয় এই পুজো। বিভিন্ন অঞ্চলে মাশানের পুজো বিভিন্নরকম। তার একটি বড় কারণ মাশানের প্রকারভেদ। এই পুজো সাধারণত আর্যরীতিতে হয় না, প্রাচীন তান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে হয়। একজন রাজবংশী দেবংশী থাকেন ভর করানো দেবদেবীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য। মেঘনাকে আজ যেন নেশায় পেয়ে বসেছে, ওর মনে হয়, প্রতিটি লোকবিশ্বাস বা কাহিনির অন্তরালে বাস্তবের ঘটনাবলীর ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে। ঠিক যেমন অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবির ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে থাকে রিয়্যালিটি। মেঘনা ঠিক করে, ওর ছবিতেও মাশানদেবতাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই ধরবে, দিকভ্রষ্ট মানুষকে পথ দেখিয়ে কল্যাণের পথে চালিত করেন তিনি।

নাহ, আর ছাড়াছুড়ি নেই, মেঘনা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়, এটাই ওর পরবর্তী ছবির সিরিজের টপিক হবে। এবার ঠিক মাশানদেবতার পুজো দেখতে কোচবিহার

বা দিনহাটা যেতেই হবে, ও তো কেবল মাশানের শোলার মূর্তিই দেখেছে, ওখানে গেলে মাশানদেবতার পাট দেখতে পাবে, দেখতে পাবে মাটির মূর্তি। আর সেই সঙ্গে জলপাইগুড়িতেও যেতে হবে। কল্লোল বিশ্বাসের মাধ্যমে যদি মাশান শিল্পীদের সঙ্গে সেরকম একটা আন্তরিক যোগাযোগ তৈরি হয় তাহলে ভেষজ রং বানানোর পদ্ধতিও শিখে নেওয়া যাবে, আর সেই সঙ্গে ওখানকার জীবনযাত্রা সম্পর্কেও একটা ধারণা তৈরি হবে। শুধু শুকনো তথ্য দিয়ে ছবি হয় না। তার জন্য বিষয়টা অন্তরে অনুভব করতে হয়। হৃদয়ের চোখ দিয়ে দেখতে পেলে তবেই নির্মাণ হবে। নইলে সে হয়ে উঠবে শুধু কিছু রঙের সমাহার।

পড়তে পড়তে কোথা দিয়ে বিকেল হয়েছে, কখন সন্ধে হয়ে সকলের ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে, মেঘনার হুঁশ নেই। আর এই পড়া তো একদিনেই শেষ হওয়ার নয়, এরপর ন্যাশনাল লাইব্রেরি, কলেজ-স্ট্রিট হামেশাই যেতে হয়েছে। এই পড়াশুনোর থেকে মেঘনার মনে যে ধারণাটা তৈরি হয়েছে তা হল, প্রকৃতির নানারকম আজব কার্যকলাপের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে আদিম মানুষ যেমন প্রথম দেবতার কল্পনা করে, মাশানও তেমনই এক পম্পরাগত লোকদেবতা এবং রাজবংশী সমাজের প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে পরতে পরতে জড়িয়ে আছে এই ঐতিহ্য। সুদীপ্তর কাছ থেকে পাওয়া মাশানের শোলার মূর্তিগুলো নিয়ে আরও খুঁটিয়ে দেখে মেঘনা। ওর শিল্পীর নজরে একটা ব্যাপার এড়িয়ে যায় না, ও লক্ষ্য করে, আদিম গুহাচিত্রে যেমন সরলরেখার ব্যবহার দেখা যায়, সেরকমই প্রাচীন অঙ্কনশৈলীর প্রভাব মাশানের মধ্যে এখনও রয়ে গেছে। এটা অবশ্য একজন প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতির গবেষকও তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন। মেঘনা যদিও কেবল জলপাইগুড়ি জেলার মাশানই দেখেছে, যা শোলার তৈরি। কিন্তু এখন বইপত্র ও বিভিন্ন প্রবন্ধে দেখছে, কোচবিহারে মাটির মূর্তি, আর দিনাজপুরে মাশানের

মুখোশ দেখা যায়। আবার নেপালে মাশানের কোনও মূর্তি নেই, সেখানে বিমূর্ত রূপের পুজো হয়। তাকে বলে 'থাপানা'। 'থাপানা' আসলে এক মাটির ঢিপি। একজন গবেষক লিখেছেন, সব জায়গার মাশান মিলিয়ে একশোছাব্বিশ ধরনের মাশানের খোঁজ পাওয়া যায়। মেঘনা ভাবে, সব সামনে থেকে দেখতে হবে। কিন্তু কবে যে যেতে পারবে! ফিল্ডওয়ার্ক করার জন্য পয়সাও একটা ব্যাপার। যদি কোনও সরকারি এইড টেইড পাওয়া যেত, কী ভালোই না হত!

**

তারপর থেকে দিনরাত এক করে কাজ করছে। হচ্ছে না। কিছুতেই হচ্ছে না। সকাল থেকে শুরু করে একেকদিন রাত্তির কাবার হয়ে গেছে, এখনও একটা ছবিরও খসড়া স্কেচটুকুই করে উঠতে পারেনি। পট নিয়ে যামিনী রায়ের কাজের পর যে আবার সেই একইভাবে সরাসরি মাশানের ফিগার নিয়ে পটের স্টাইলে এঁকে কোনও সাড়া ফেলা যাবে না, সেটা ও ভালোই বুঝতে পারে। ও অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্ম নিয়ে খেলতে চায়। অথচ, মাশানের ছবি থেকে বিমূর্ত রূপ বের করে আনা যে কী মুশকিল! ভাবছে একভাবে, কিন্তু কাগজ পেনসিল নিয়ে বসলে সেই ভাবনাটা আর কিছুতেই ঠিকমতো ধরা দিচ্ছে না। পৃথিবীর, এই মানবসমাজের এখন এক অসুখপর্ব চলছে। কুষ্ঠরোগীর মতো ক্ষত তার সারা শরীরে। সেই সমস্ত পুঁজ রক্ত গ্যাংগ্রিন নিংড়ে দিতে হবে ব্রাশের স্ট্রোকে, তবেই না বিষয়টা ছবি হয়ে উঠবে। প্রতিদিন সেই চেষ্টাই চালিয়ে গেছে আর প্রতিদিনই শেষমেশ বিরক্ত হয়ে ব্রাশ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এ যেন এক আজব চোরপুলিশ খেলা, বিষয় তার হাতে ধরা দেব ধরা দেব করেও কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না। তা ছাড়াও মিডিয়াম নিয়ে চিন্তাটাই সবচেয়ে বেশি ভোগাচ্ছিল। মাশান নিয়ে কোন মাধ্যমে

কাজ করলে ভালো হয়, সেটাই কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারেনি। অয়েল বা অ্যাক্রেলিক বড্ড চোখে লাগবে, আর জলরং তো এক বহু-ব্যবহৃত মাধ্যম। পটের কাজ এসব মাধ্যমে অনেক হয়েছে। আজ কল্লোল মজুমদারের সঙ্গে কথা বলে সেই ভাবনা কিছুটা হলেও দূর হল। এখন ভেতরে ভেতরে একটা জেদ কাজ করছে, ভেষজ রং তৈরি করা শিখতেই হবে। নইলে শুধু স্কেচের মেরিটে ওর ছবি আর পাঁচজনের থেকে আলাদা কোনও প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারবে না। আর কোন সারফেসের ওপর কাজ করবে, সেটাও মাথায় আসছে না। আর্ট পেপার চলবে না, ক্যানভাসও নয়, ইন্ডিয়ান বা নেপালি হ্যান্ডমেড পেপার তাও চললেও চলতে পারে। কিন্তু, সাংঘাতিক ব্যতিক্রমী কিছু হবে না। তাহলে... ভাবতে হবে, ভাবতে হবে...

উফফ, আবারও চোখ জড়িয়ে আসছে। আর কি কোনোদিন কল্লোল বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা হবে!

৫

তমালের মোবাইল বাজছে। এত রাতে, আবার নতুন করে কোনও গন্ডগোল হল! অজানা নাম্বার থেকে ফোন দেখে তমালের ভ্রু কুঁচকে যায়, হ্যালো মিস্টার রয় আমি সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চ কলকাতা থেকে বলছি, আপনি যে ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা চেক করতে বলেছিলেন সেটা ভেরিফাই করা হয়ে গেছে। জেনুইন কেস, কোনও ফেক অ্যাকাউন্ট না। তবে বিদেশি লোকেদের সঙ্গে, স্পেশালি ফ্রান্স আর ইটালির কিছু লোকের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। কিন্তু তারাও জেনুইন।

ওকে, থ্যাঙ্ক য়্যু সো মাচ, বলে তমাল ফোনটা কাটে।

কিন্তু সত্যি সত্যিই কি থ্যাঙ্কফুল হতে পারে তমাল! যাও বা একটা আলো দেখা গিয়েছিল, তাও ঘোলাটে হয়ে গেল। মেঘনাই কি প্রাইম সাসপেক্ট! নাকি ওকে ইউজ করে অন্য কেউ কাজ সালটে নিচ্ছে, তমাল কিছুটা দ্বিধায় পড়ে যায়। এ যেন প্যাঁচের ভেতরে প্যাঁচ। ছবি উধাও, মেঘনা উধাও, অথচ দুটোকে কিছুতেই লিংক-আপ করা যাচ্ছে না। তমালের মতো দুঁদে অফিসারও হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। দেখা যাক ফিংগারপ্রিন্ট কী বলে! কালকের আগে কিছুই হবে না। কুকুরগুলো যে স্পটটাকে আইডেন্টিফাই করল সেখানেও তো কটা জুতোর দাগ আর মদের বোতল ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। কিন্তু, তমাল রায়, তুমি কি সত্যিই মেঘনাকে প্রাইম সাসপেক্ট বলে মানতে পারছ! নাকি অল্প বয়েসের দুর্বলতা তোমার বোধবুদ্ধি

সব ঘেঁটে দিচ্ছে? শোয়ার ঘরের জানলাটা খুলে দিয়ে তমাল একটা সিগারেট ধরিয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করে।

মেঘনাকে ছুঁয়ে সেদিন কথা দিয়েছিল কোনোদিন ছেড়ে যাবে না। সদ্য লাঙল চালানো মাটির মতো মন নিয়ে ওরকম কথা তো কতজনই দেয়। রাখতে পারে? তমাল পেরেছে? লেক থেকে ফিরে ইস্তক তমালের কেবলই মনে হচ্ছিল মা ঠিক মুখ দেখে কিছু বুঝে যাবে। তাই বাড়ি ফিরেই বই নিয়ে বসে পড়ে, যেন কত মন পড়ায়। এদিকে বইয়ের পাতায় অক্ষরগুলো যেন বেঁকেচুরে মেঘনা সান্যালের মুখ হয়ে উঠছে। আজকের মতো পড়াশুনো শিকেয় উঠে গেল। মেঘনার গায়ে যেন লেবুফুলের গন্ধ, মেঘনাই কি সেই লিরিল-বালিকা, যে তমালের একান্ত ঝরনায় গোপনে স্নান সেরে নেয়। নাকি তমাল ভিজে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে ওই মেঘনা নদীতে। সব বোঝা যায় না, বোঝার বয়েসও না, শুধু ছুঁয়ে থাকতে ইচ্ছে করে, কী তপ্ত মেঘনার হাতের তালু! ওরও কি জ্বর আসে তমালের মতো? কিছু বুঝতে পারে না, শুধু মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখে বিছানা ভিজে গেছে। একটা অপরাধবোধ কাজ করে ভেতরে ভেতরে। মেঘনারও কি হয়, মেয়েদের এরকম হয়! এই কথাগুলো কাউকে বলার নয়, এমনকি ওর প্রিয় বন্ধু কিশোরকেও বলা যায় না।

I love you as the plant that never blooms
but carries in itself the light of hidden flowers;

একা একা থাকলেই আজকাল একটা ঘাসফড়িং চলে আসে তমালের কাছে।

কী এত পড়?

ও তুমি বুঝবে না।

বলোই না।

ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথস... কিছু বুঝলে?

আমি তো শুধু জলের ভাষা বুঝি, হাওয়ার ভাষা বুঝি।

বললাম তো বুঝবে না। যাও আমার পড়া আছে।

তুমি কি সত্যি সত্যি পড়ছ? তুমি তো আলো নিয়ে খেলছ। আলোর নদীতে ডুব দেওয়ার পর আর কেউ মানুষ থাকে নাকি! সে তো পাখি হয়ে যায়।

কী যে সব বল কিচ্ছু বুঝতে পারি না,

I love you without knowing how, or when, or from where.

I love you straightforwardly, without complexities or pride;

পাবলো নেরুদা জান? আমার প্রিয় কবি।

আমার প্রিয় কবি রং। যখন একজন মানুষ ভালোবাসে, তখন তার রং সবুজ হয়ে যায়, ঠিক আমার মতো।

তুমি তো খুব গোপ্পে আছ, মানুষ আবার সবুজ হয় কখনও!

হয় তো। এই যে তুমি এখন সবুজ মানুষ। যেন একটা নতুন মাঠে গড়াগড়ি দিয়ে উঠলে এইমাত্র।

অত কিছু জানি না, তবে এখন আমার খুব চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, আমি ভালোবাসি-ই-ই।

**

জনবসতি পেরিয়ে যাওয়ার পর লোকবাহাদুর সুদীপ্তকে এবার সিটে ঠিকমতো বসতে বলে। সোজা হয়ে বসে হাত পায়ের জট ছাড়াতে ছাড়াতে সুদীপ্ত বলে, আপনার কী মনে হয়, মেঘনাদিকে কারা ধরে নিয়ে যেতে পারে? দিদি তো হোমস্টেতেই ছিল, সেখান থেকে এভাবে উধাও হয়ে যাওয়া খুব আশ্চর্য না? হোমস্টেটা সেফ তো?

না না ভাইয়া আপনি চিন্তা করবেন না, ওই হোমস্টেতে আমি গত সাত আট বছর ধরে ট্যুরিস্ট নিয়ে আসছি, কখনও কিছু হয়নি। আসলে আপনারা জানেন না সিকিমেও এখন বহু গুন্ডা বদমাশ ঢুকে গেছে। দিদিকে দেখতে শুনতেও ভালো, সেজন্যই হয়তো কেউ তুলে নিয়ে গেছে। কিন্তু, হোমস্টের ঘর থেকে... এটা না-মুনকিন। আপনি শিওর যে উনি সেদিন ঘরেই ছিলেন?

তা তো বলতে পারব না, সেদিন আমি এত টায়ার্ড ছিলাম যে, বিকেলে চা খাওয়ার পর দিদির সঙ্গে আড্ডা না দিয়ে আমি নিজের ঘরে রেস্ট নিচ্ছিলাম, সুদীপ্ত বলে, তবে এটা জানি, দিদি মাঝেমাঝে সন্ধে র দিকে ওই ভিউপয়েন্টটাতে একা একাই গিয়ে বসে থাকত। সেদিন গিয়েছিল কিনা খেয়াল করিনি।

তার মানে কেউ ওকে ফলো করেছে। আর আপনারা ওই ছবিটবি কীসব নিয়ে কাজ করছেন, সেসব খবর পেলে তো আর কথাই নেই। এখানে এখন প্রচুর স্মাগলারের দল আছে। এই ক-দিন আগেই কিরাজড়ি নিয়ে একদল ধরা পড়ল, এই এসপি সাহেবই তো ধরলেন। এখন পুরোনো ছবি, মূর্তি এইসব জিনিস বিদেশিদের কাছে বিক্রি করলে হেব্বি লাভ। যাক গে অত ভাববেন না, আপনাকে আমার এক দোস্তের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, ও এখানকার লিডিং পার্টিতে খুব ইনফ্লুয়েনশিয়াল। ওর থেকে কিছু না কিছু হেল্প পাবই। আমার স্কুলবেলার বন্ধু, আমি কোনও কাজ নিয়ে গেলে কখনও ফেরায় না। সবচেয়ে বড় কথা হল, লোকটা খুব অনেস্ট। অন্য নেতাদের মতো চুরিটুরি করে না, আর দুমুখোও নয়।

আরিতারে পৌঁছে লোকবাহাদুর একটা বড়সড় ভিলা মতো বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করায়। হর্ন দিতেই উর্দি পরা দারোয়ান দৌড়ে এসে গাড়ির ভেতর টর্চের আলো ফেলে সব দেখে নিল। তারপর পরিচিত লোক দেখে, আইয়ে, বলে গেট খুলে দিল।

দাদা, যা বলার আমি বলব, আপনি প্রথমেই কিছু বলবেন না।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আর বলতে, সুদীপ্ত জানে এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে ভরসা করার মতো মানুষ বলতে একমাত্র এই লোকবাহাদুরই। মফস্সলের ছেলে সুদীপ্ত জীবনে এরকম ঝাঁ চকচকে বাড়িতে ঢোকেনি। ওর বেশ ভয় ভয় করছিল।

বিশাল ড্রয়িংরুমের একপাশে একটা প্রায় সিংহাসনের মতো কারুকার্য করা সোফায় একজন লম্বাচওড়া চেহারার লোক বসে আছে। চোখমুখ ইতিমধ্যেই পানীয়ের প্রভাবে লাল। সুদীপ্তর দেখেই খটকা লাগে, এ কেমন জায়গায় নিয়ে এল লোকবাহাদুর, এরকম একটা লোককে কতখানি ভরসা করা যাবে কে জানে! লোকবাহাদুর ওকে নমস্কার করে স্থানীয় ভাষায় কিছু কথা বলে। লোকটি ইঙ্গিতে ওদের বসতে বলল, হ্যাঁ, এবার আপনি বলুন তো আমাকে প্রথম থেকে, ঠিক কী কী হয়েছে, অর্ডারের ভঙ্গিতে লোকটি বলে।

সুদীপ্ত মেঘনার সঙ্গে ফেসবুকে আলাপ থেকে শুরু করে ওর রিসার্চ, মেঘনার পেইন্টিং, ওদের এখানে আসার কারণ, তারপর হঠাৎ করে মেঘনার উধাও হয়ে যাওয়া, সব কথা খুলে বলে। লোকটি প্রায় মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাতটা নেড়ে বলে, ও এই ব্যাপার, আমি ভাবলাম, কী না কী! ইয়ে তো মেরা বাঁয়ে হাথ কা খেল। ডরো মত, এই নোরবু থাকতে তোমাদের কোনও চিন্তা নেই। কোন মাই কা লাল আছে, আমার চোখে ধুলো দিয়ে সিকিম থেকে একজন মহিলাকে কিডন্যাপ করে। আর ওই ছবির কথা বলছ, সেও আমি ঠিক খুঁজে বের করে দেব, এখানকার সব লোক আমার কথায় ওঠে বসে।

সুদীপ্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে নমস্কার করে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু নোরবু ওদের আবারও বসতে ইশারা করে, কাঞ্ছা কাঞ্ছা বলে কাকে যেন ডাকে। একটা বেঁটে কিন্তু বলিষ্ঠ চেহারার ছেলে ট্রেতে করে দুকাপ কফি নিয়ে

আসে। এই মুহূর্তে বসে বসে কফি খাওয়ার মতো সময় বা মানসিকতা কিছুই ওদের নেই, সামনে এখন অনেক কাজ। ওরা তাই বারবার আপত্তি জানায়। কিন্তু নোরবু কি কারোর কথা শোনার মতো বান্দা! সেও ওদের কফি না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বে না।

আরে ইয়ার, ইতনে দিনো কে বাদ আয়া, বয়ঠো, কফি পিও, চাহো তো দুসরা চিজ ভি পি সাকতে হো, কাঞ্ছা... বলতে বলতে লোকটি উঠে দাঁড়ায়, এত জলদির কী আছে, বসো, আমি এক্ষুনি আসছি। লোকটি মোবাইলের স্ক্রিন আনলক করতে করতে বিশাল ঘরের অন্য প্রান্তে চলে যায়। ওরা শুধু দেখতে পায় সে ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে, কিন্তু এত দূর থেকে কিছু শোনা যায় না।

৬

প্যারিসের এক শহরতলি। সন্ধে সাড়ে সাতটা। একটা প্রশস্ত বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। সামনে সযত্নে লালিত বাগান, লন, টেনিসকোর্ট। স্যুইমিং পুলের জলে হালকা হাওয়ায় ছোট্ট ছোট্ট ঢেউ উঠছে। একটা ঘরে বড়সড় স্টাডি টেবলের ওপর ল্যাপটপ খোলা। কেতাদুরস্থ পোশাক পরা এক ভদ্রলোক সামনে বসে। ল্যাপটপের দিকে নজর করলে দেখা যাবে গুগল সার্চে মাশান শব্দটা জ্বলজ্বল করছে। আজই মেইলটা এসেছে। ইন্ডিয়ার সিকিমের এক প্রত্যন্ত মনাস্ট্রিতে বহু পুরোনো কিছু পট পাওয়া গেছে যেগুলো খুবই দুর্লভ। পটগুলো ওদের কোনও লোকদেবতার। মসিয়ে ইলিয়াসের ইন্ডিয়ার এজেন্ট জানিয়েছে, এই পটগুলো সে আগামী দু-চারদিনের মধ্যেই বিক্রি করতে চায়। মসিয়ে ইলিয়াস প্যারিসের একজন বিখ্যাত আর্ট কালেক্টর। ওঁর সংগ্রহ প্যারিসের অন্যান্য আর্ট-কালেক্টরদের কাছে এক ঈর্ষার বিষয়। প্রায় বেশিরভাগ বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা ছবির মূল কপি ওঁর গ্যালারিতে আছে। পৃথিবীর মোটামুটি সব দেশেই তাঁর নিজস্ব এজেন্ট আছে। বেশ কয়েকবছর হল লোকশিল্পের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়েছে। আর ভারতবর্ষ তো লোকশিল্পের খনি। রাজস্থান, বিহার, ঝাড়খন্ড, মণিপুর, মেঘালয় ভারতের এমন কোনও জায়গা নেই, যেখানকার লোকচিত্র তাঁর সংগ্রহে নেই। তবে তিনি বাজিয়ে না দেখে কেনার লোক না, প্রথমদিকে অনেকবার ঠকে, তবে এই শিক্ষা

হয়েছে। তাই আজও ভালো করে খোঁজখবর করে, তবেই তিনি এজেন্টকে কনফার্ম করবেন। মাশান সম্পর্কে পড়তে গিয়ে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। ক-দিন আগেই একজন ভারতীয় পেইন্টারের ফেসবুক পেজে তিনি মাশানের ছবি দেখেছিলেন। উজ্জ্বল রং আর জিওমেট্রিক প্যাটার্নের জন্য তখনই একটা আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এই মাশানের ঐতিহ্য যে এতটা প্রাচীন, তখন তা বুঝতে পারেননি। মসিয়ে ইলিয়াস টেবলে একটা ঘুসি মারলেন। এই পটগুলো তাঁর চাইই চাই। মেইল টেইল নয়, সরাসরি ফোনে ধরলেন তাঁর এজেন্ট মিস্টার শর্মাকে, যত টাকা লাগে লাগুক, পটগুলো তুমি আমাকে ছাড়া কাউকে দেবে না, আমি ইমিডিয়েটলি লোক পাঠাচ্ছি।

স্যার, আপনার জন্যই ওগুলো জোগাড়ের চেষ্টা করছি, আর এক দুটো দিন লাগবে স্যার। আমি এর জন্যই লোক না পাঠিয়ে নিজেই স্পটে এসেছি। তবে খুব ঝামেলার কাজ, ধর্মীয় আবেগ জড়িয়ে আছে, একবার ফেঁসে গেলে পুলিশ আমার জান কয়লা করে দেবে, শর্মা বিগলিত স্বরে বলে।

বেশি চালাকি করার চেষ্টা করো না, বলছি তো, যত টাকা লাগে দেব, শুধু পটগুলো আমার চাই, আগেরবার সেই তারার মূর্তি নিয়ে যা ঝুলিয়েছিলে, আমার এখনও মনে আছে। এবার কিন্তু দেরি করলে চলবে না, সামনের মাসেই আমার গ্যালারিতে একজিবিশন, আমি ম্যাক্সিমাম সাতদিন সময় দিচ্ছি। আর শোনো, তোমাকে বারবার বলেছি, এসব ব্যাপারে মেইল করবে না। কেন, তোমাকে মাসে মাসে এতগুলো করে টাকা দিই, একটা কল করতে পারো না? এসব কথা মেইলে বলা মানেই প্রমাণ রেখে দেওয়া, মসিয়ে ইলিয়াসের গলা উত্তরোত্তর চড়তে থাকে।

কোনও টেনশন নেবেন না স্যার, আমি কথা দিচ্ছি, সাতদিনের ভেতরেই আপনার লোকের হাতে মাল

চলে যাবে। আমাকে আপনি আজও চিনলেন না! শর্মা, এক বাপের ব্যাটা আছে স্যার।

ফোন রেখে, শর্মা টেনে একটা চড় লাগায় পাশে কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটাকে, শালা, কোনও কম্মের না। বললাম যাবি, লামাটাকে ভয় দেখিয়ে মাল নিয়ে সিধা চলে আসবি, তুই শালা মালটাকেই খালাস করে দিলি, এদিকে আসলি চিজ লোপাট। এখন পুলিশের ম্যাঁও সামলাব না পট উদ্ধার করব? পট কি সাপ না ব্যাঙ যে, এক রাত্তিরের মধ্যে ফুড়ুৎ হয়ে যাবে! মেয়েছেলেটাকে পুঁছতাছ কর, দরকার হলে ভয় দেখা। ওই শালি সব জানে। মাল আমার কালকের মধ্যেই চাই, না হলে তোর অবস্থাও লামার মতো করে দেব, মনে থাকে যেন।

পাশের ছেলেটা মাথা নিচু করে বলে, সরি বস, ভুল হয়ে গেছে। এবার আর কোনও গড়বড় হবে না। আমরা তো যা করার করবই, সঙ্গে মালাকেও নিয়ে যাব, এইসব কেসে একটা মেয়েমানুষ সঙ্গে থাকলে অনেক সুবিধে। মেয়েছেলে কিডন্যাপ করার বহুত লফড়া। একে তো মার্ডার কেস হয়ে গেল, এরপর রেপ কেসও হয়ে গেলে জিন্দেগি বরবাদ। আর এই অফিসার তমাল রায় বহুত টেঁটিয়া আদমি আছে। মাল খায় না, মেয়েছেলের দোষ নেই, মাল্লুও নেবে না, এক্কেবারে থার্ডক্লাস।

একটা চার অক্ষরের গালি দিয়ে শর্মা বলে, শোন রোহিত, আমাকে অফিসার দেখাস না, ওরকম কত ভালোমানুষ অফিসার দেখলাম! ও আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব। তুই একটা সামান্য মেয়েছেলেকে সাইজ করতে পারছিস না! দরকার হলে মারধোর লাগা, রেপের ভয় দেখা, ওই এক জায়গায় সব মাল সমান, টাইট হয়ে যাবে। এখন যা। সব কাজ বরবাদ করে দিলি শালা। লেপার্ডের চামড়াগুলোর জন্য এনজেপিতে লোক ওয়েট করছে। কালকের মধ্যে ডেলিভারি না দিলে, লাখ লাখ টাকার লোকসান হয়ে যাবে। করিম, তুই মাল নিয়ে এক্ষুনি শিলিগুড়ি

রওনা হয়ে যা। আর রোহিত, তুই মালাকে তুলে নিয়ে মেয়েটার ওখানে চলে যাবি। সোনাম একা আছে, এইসব কলকাতার মেয়েছেলে বহুত চালু আছে, ওর মতো গান্ডু মালের ভরসায় এদের ছাড়া যায় না। আর শোন, যা করবি পুলিশের ঝামেলা সামলে। কোনরকম কঁ্যাচরা দেখলেই শেল্টার চেঞ্জ করবি, আমার সব বলা আছে। যদি ধরা পড়িস, আমি কিন্তু তোদের চিনি না।

রোহিত আর করিম ঘর থেকে বেরিয়ে গজগজ করে। বস খালি চমকাবে, নিজে তো এখন বসে বসে স্কচ আর চিকেন প্যাঁদাবে, আর আমরা এই ঠান্ডার মধ্যে কোথায় পট, কোথায় কী, সব খুঁজে মরি। আমাদের মাইরি জানের কোনও ভ্যালু নেই। শালা ছারপোকার জীবন। নিজে কোটি কোটি মাল্লু কামাবে, আমাদের বেলায় স্রেফ দু-দশ হাজার। সেই ক্লাস নাইনে পড়তেই শালার বাপটা মাল টেনে টেনে টেঁসে গেল, এদিকে বাড়িতে এতগুলো পেট। নইলে আমিও পড়াশোনা শিখে এতদিনে ওই গুরুং-এর মতো দারোগা হতাম। জানিস আমি ইস্কুলে পড়তে একবারও ফেল করিনি, রোহিত বলে।

আবে চোপ বে, এক ভ্যানতাড়া রোজ রোজ করিস না তো। ওরকম আমিও পারতাম। দার্জিলিংএ কনভেন্ট স্কুলে পড়তাম। পাহাড়ে গন্ডগোল শুরু হয়ে গেল, আর আমাকেও রাজনীতির নেশায় পেয়ে বসল, পড়াশুনো সব শিকেয় উঠল। কী করে কী করে যেন এই শর্মার পাল্লায় পড়ে গেলাম। এখন তো আর বেরিয়ে যাওয়ারও কোনও চান্স নেই, করিম একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে আলগোছে ঠেকায়। কাজের কথা শোন, বস তো মালাকেও এই কাজে ভিড়িয়ে দিল, এদিকে আমি থাকছি না। এ বহুত গড়বড় কেস আছে, টেনশন ধরে গেল মাইরি। মা কসম বলছি, ওর কিছু হলে কিন্তু আমি তোদের দুটোকেই জানে মেরে দেব।

৭

ওষুধের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে কতক্ষণ ধরে পড়ে ছিল খেয়াল নেই। ঘরের দরজায় শব্দ হতেই চমকে উঠে দেখে দুটো ছেলে আর একটা মেয়ে,

মালা, যা মুখটা খুলে দে, লম্বা ছেলেটা বলে। ছেলেটার চেহারা ছবি দেখেই সুবিধের লাগে না মেঘনার। মাথার চুল কানের পাশ থেকে প্রায় ন্যাড়া, ওপরের দিকে মোহক স্টাইলে কিছুটা উগ্র লাল আর সোনালি রং করা, এক কানে অদ্ভুত একটা দুল, পোশাক-আশাক সব মিলিয়ে পাক্কা মাস্তানের মতো দেখতে।

মালা নামে মেয়েটা পাহাড়ি, নাক-চোখের আদলে, গায়ের রঙে বোঝা যায়, এসে বাঁধনটা খুলতেই মেঘনা হাতের ইশারায় জল খেতে চাইল। ওর তখন আর একটা শব্দও উচ্চারণ করার মতো শক্তি নেই। গলাটা একেবারে শুকিয়ে খটখটে হয়ে আছে। একটা বোতল ওর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে মেয়েটা বলে, আমাদের কাছে খবর আছে তুমি ওই লামার কাছে ছবিগুলোর জন্য যেতে, ভালোয় ভালোয় বলে দাও ছবিগুলো কোথায় আছে।

জল খেয়ে কিছুটা ধাতস্থ হয়ে মেঘনা বলল, আমি জানি না, আমি কিচ্ছু জানি না। আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছ, কেন নিয়ে এসেছ?

ভুজুং ভাজুং দিয়ে যা ইচ্ছে বুঝিয়ে দেবে আর আমরাও বিশ্বাস করে নেব, আমাদের এত গান্ডু মাল পেয়েছ! ন্যাকা সাজা হচ্ছে, জানি না! জানি না

বললেই হবে, তুমি রোজ মঠে যেতে ছবি আঁকতে, পাক্কা খবর। আমাদের লোক সবখানে আছে। বলেছে লামার ঘরেই বাক্সের মধ্যে ছবিগুলো ছিল। আমারা ভালোমতোই জানি, কাল রাতেও তুমি লামার ঘরে গিয়েছিলে। তারপরই একদম উবে গেল, ভোজবাজি, ইল্লুশ! সোজা কথায় না বললে কী করে কথা বের করতে হয় সেটা আমাদের জানা আছে, লম্বা ছেলেটা বলে।

আমি সত্যিই জানি না। আমাকে আটকে রেখে তোমাদের কোনও লাভ হবে না। এটা কোন জায়গা? একবার এখান থেকে বেরোই, আমি কিন্তু পুলিশকে সব বলে দেব, তারপর তোমাদের কী হাল হয় দেখো, মেঘনার গলার স্বরে স্পষ্টতই ঝাঁজ প্রকাশ পায়।

এবার মালা এগিয়ে এসে ঠাস করে একটা চড় মারে ওর গালে, পুলিশকে বলা বের করছি তোমার। মাল বুঝিয়ে না দিয়ে এখান থেকে কী করে বেরোও সেটা আমরাও দেখে নেব। খালি বড় বড় বাতেল্লা! পুলিশকে বলে দেবে, শালি কুত্তি কাঁহিকা!

শোনো ম্যাডাম, অত পুলিশ ফুলিশ দেখিয়ো না, তোমার মতো মেয়েছেলেকে টাইট দেওয়া আমার বাঁয়ে হাথ কা খেল। এখান থেকে কী করে জ্যান্ত ফিরে যাও আমিও দেখে নেব, আমার নামও রোহিত।

প্রচণ্ড অপমানিত বোধ করলেও, মেঘনা বোঝে, এদের সঙ্গে মাথা গরম করে কিছু লাভ হবে না। অন্য সময় হলে ও উলটে একটা থাপ্পড় মেরে দিত। কিন্তু এখন দাঁতে দাঁত চেপে অপমানটা গিলে নেয়। এরা সবকটা মার্কামারা বদমাশ, ওদের সঙ্গে বুদ্ধির খেলা খেলতে হবে, বেশ, তোমাদের কথা মেনে নিলাম, আমি জানি ছবিগুলো কোথায় আছে। কিন্তু আমাকে মেরে ফেললে তোমরা কী করে ওগুলোর হদিস পাবে!

বেশি চালাকি না করে তুমি আমার কথার জবাব দাও। বোঝাই যাচ্ছে রোহিত বলে ছেলেটাই এদের লিডার।

অত সহজে তো আমার থেকে কথা বের করতে পারবে না, আমি যা জানতে চাইছি তা না বললে তোমাদের এই পটগুলোর ব্যাপারে কিছুই বলব না, মেঘনা উলটো চাপ দেয়।

বেঁটে ছেলেটা মাঝখান থেকে ফট করে বলে, জানো, বেশি টেরিবেরি করেছিল বলে লামা আর নেই, খাল্লাশ। তুমি না বললে তোমারও ওই হালত হবে।

আব্বে সোনাম চোপ, বেশি মাতব্বরি করলে লাশ ফেলে দেব। কে বলেছে তোকে এত ফরফর করতে? সব ব্যাপারে খালি পক পক পক পক, রোহিত ধমক দেয়।

এক নিমেষে মেঘনার পায়ের তলা থেকে মাটি খসে যায়। কেউ যেন একটা অতলান্ত পাহাড়ি খাদের ভেতর ওকে ধাক্কা দিয়ে এইমাত্র ফেলে দিল।

মেঘনার শরীরটা এবার কাঁপতে থাকে। সেটা ভয়ে না কান্নায় সহসা বোঝা যায় না, ও নিজেও বুঝতে পারে না। একটা হিমশীতল স্রোত, এ্কটা শিরশিরানি মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে আসে। চিবুকের পেশি শক্ত করার চেষ্টা করতে গিয়ে বোঝে সে চেষ্টা বৃথা। ওর জেদি একরোখা ব্যক্তিত্বও এই ঘটনায় টাল খেয়ে যায়। মেঘনা বুঝতে পারে এ বড়ো সহজ ঠাঁই নয়। এখানে খুব ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে, বুঝে সমঝে কথা বলতে হবে।

মালা আরও একবার মারার জন্য হাত তুলতেই রোহিত ওর হাতটা চেপে ধরে, এখন থাক। এ শালি এখন এমনিতেই ভয়ে আধমরা আছে। ঠান্ডা হোনে দো জরা। চল, আভি বাহার চল ইয়ার।

এই ম্যাডাম, একদম চিৎকার করবে না, তাহলে কিন্তু... নেহাত মেয়েছেলে বলে, না হলে এতক্ষণে কেলিয়ে তোমার পেটের থেকে সব কথা বার করে নিতাম। এতক্ষণে মেঘনার নজরে আসে রোহিতের হাতে একটা পিস্তল, সেটা ও মেঘনার কপালে ঠেকিয়ে

মুখ দিয়ে একটা গুলি করার মতো ভঙ্গি করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর ভয়টা যেন আরও চেপে ধরে মেঘনাকে। পিস্তলের নলের ঠান্ডা স্পর্শটা যেন চামড়া ভেদ করে ঢুকে গেছে। এখনও সমস্ত শরীরটা কাঁপছে। ও বুঝতে পারে, এরা যে ধরনের লোক, যা ইচ্ছে করতে পারে ওর সঙ্গে। রেপ, মার্ডার যা খুশি। শেষ অব্দি এই ছিল কপালে! সে মেঘনা সান্যাল, এরপর খবরের কাগজ বা টিভির পর্দায় শুধুমাত্র একটা ছবি, একটা কালো কফিনবন্দি লাশ। বাবা-মার মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। খুব কান্না পায়। দাঁতে দাঁত চেপে ও প্রাণপণে চেষ্টা করে যাতে কান্নার আওয়াজ ঘরের বাইরে না বেরোয়, শুধু টের পায় নোনতা জলে ওর গাল ভিজে যাচ্ছে। তারপর কান্নাও একসময় থেমে গিয়ে একটা তীব্র জেদ তৈরি হয় ভেতরে ভেতরে। এর প্রতিশোধ নিতেই হবে। এদের সবকটাকে জেলে ঢুকিয়ে তবে ওর ছুটি। তাতে ছবির সিরিজ শেষ হতে দেরি হোক বা আদৌ সিরিজটা নাই হোক, এই খুনি বদমাশগুলো শাস্তি না পাওয়া অব্দি ওর ভেতরে খচখচ করতে থাকা কাঁটাটা কিছুতেই বেরিয়ে আসবে না। কত স্বপ্ন নিয়ে কাজটা শুরু করেছিল, আর এই তার পরিণতি!

সেদিন খবরের কাগজে কমলেশদার একজিবিশন নিয়ে বড়ো করে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে। মেঘনারও খালি মনে হত, একদিন তার ছবিরও এরকম বিজ্ঞাপন হবে, বড়ো বড়ো আর্ট-কালেক্টররা ওর ছবি নিজেদের গ্যালারিতে রাখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠবেন, কী সুন্দর সেইসব দিন! মেঘনার দিবাস্বপ্নের তার কেটে যায় মোবাইলের ঝনঝনানিতে। সুদীপ্ত ঘোষের ফোন,

ব্যস্ত? ডিস্টার্ব করলাম না তো?

না না, বলো।

সংক্ষেপে বলছি। আর ফোনে সব কথা বলে বোঝানোও যাবে না। সাংঘাতিক একটা খবর আছে।

মাশানের বিষয়ে এমন কিছু তথ্য পেয়েছি যার খোঁজ এখনও অব্দি কেউই জানে না।

ওয়াও, গ্রেট! একটু হিন্টস দাও প্লিজ...

সিকিমের এক পুরোনো মনাস্ট্রিতে কিছু পট এসেছে। আমার এক বন্ধু ওখানে আছে, ওই গতকাল আমাকে ফোনে জানিয়েছে। ও গেস করছে, ওগুলো মাশানের পট। আমি এর মধ্যেই সিকিম যাচ্ছি।

তাই! কবে?

সামনের উইকএন্ডে। আপনি আসতে পারবেন?

এমন একটা খবর দিলে, এরপর আর না গিয়ে পারা যায়! আমার তো মনে হচ্ছে এক্ষুনি ছুটে চলে যাই। টিকিট পাওয়া একটা ফ্যাক্টর বটে, তবে আমি যে করেই হোক ম্যানেজ করব।

এই রুটে টিকিট পাওয়া সত্যিই একটা ফ্যাক্টর। মেঘনার আগের অভিজ্ঞতা অন্তত তাই বলে। সামনের উইকএন্ড মানে, আজ শুক্রবার, এর পরের শুক্রবার। মাঝে আর সাতটা মাত্র দিন। এত তাড়াতাড়ি কি টিকিট পাওয়া যাবে! আর না পেলে অগত্যা তৎকালে করতে হবে। তখন নাহয় এজেন্ট ধরা যাবে। একবার নিজেই ট্রাই করে দেখা যাক। শুধু শুধু আগে থেকেই এতগুলো অতিরিক্ত পয়সা খরচ করার মতো অবস্থা তার নয়। দুরুদুরু বুকে লগ ইন করল। যেরকম গতানুগতিকভাবে দিনটা শুরু হয়েছিল, মেঘনা ভেবেছিল আজও সারাদিন সেভাবেই কেটে যাবে, রোজকার মতো ছবির সিরিজটা দাঁড় করানোর ব্যর্থ চেষ্টায়। কিন্তু, সুদীপ্তর ফোনটা এসে ওর দিনটাই বদলে দিল। আর কী কপাল, দার্জিলিং মেলে একটা বার্থও পেয়ে গেল। দ্রুত পেমেন্ট ইত্যাদি সেরে, মেসেজ চেক করে, তবে শান্তি। এবার অন্যান্য কাজকর্ম। গরমজামা বের করে রোদে দেওয়া। বাবা-মাকে ফোন করা। অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে দেখে নেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। আগে সুদীপ্তকে কনফার্ম করতে হবে,

হ্যালো সুদীপ্ত, টিকিট পেয়ে গেছি। সামনের বেস্পতিবার রাতের ট্রেন।

আমি এনজেপিতে থাকব। সোজা ওখান থেকেই রওনা দেব।

সুদীপ্ত ঘোষের সঙ্গে প্রথম আলাপ ফেসবুকে। ওর ফেসবুক পেজেই প্রথম মাশানের ছবি দেখে আকৃষ্ট হয় মেঘনা। এই নিয়ে ইনবক্সে টুকটাক কথাবার্তাও চালায়। তারপর গতবছর চাপড়ামারি বনবাংলোয় বেড়াতে গিয়ে সামনাসামনি দেখা। ওর লাটাগুড়ির বাড়িতেই মেঘনা প্রথম মাশানের শোলার মূর্তি দেখে। একেকটা ছয় কি আট ইঞ্চি মতো লম্বা, লাল কালো আর সাদা রঙের জিওমেট্রিক্যাল প্যাটার্ন আঁকা শরীর। মুখেচোখের একটা উগ্রভাব ওইটুকু একটা মূর্তির মধ্যেও ফুটে উঠেছে। সুদীপ্ত বলছিল, ও নাকি ছোটোবেলায় দেখেছে কেউ অসুস্থ হলে মাশানদেবতার কাছে তার আরোগ্য কামনা করে পুজো দেওয়া হত। একটা মনোমতো বিষয় পেলে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া মেঘনার বরাবরের অভ্যেস, এই তো ক'দিন আগেই বাংলার টেরাকোটার কাজ নিয়ে নিয়ে একদম দিনরাত মেতে ছিল। সারাক্ষণ ওই বিষয়ের ওপর বই পড়ছে, বাড়িতেই ছোটোখাটো একটা ফার্নেসমতো বানিয়ে মাটির কাজ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছে। সবকিছুর শেষ না দেখে ও শান্তি পায় না। সুদীপ্তর মুখে মাশানের কথা শুনে ওর ভেতরের তাগিদটা আরও চাড়া দিয়ে ওঠে। কেন-না, এতদিনে ও এটা বুঝতে পেরেছে, গতানুগতিক ছবি আঁকা ওর পথ নয়। ওকে অন্যরকম কিছু করে দেখাতে হবে, ছবির প্রচলিত ধারণাগুলো ভেঙে ফেলতে হবে। হবেই। তখনই মনে হয়, আরে এটাকেই উপজীব্য করেই তো পরবর্তী ছবির সিরিজটা করা যায়। সেই প্রথম মাশান নিয়ে ভাবনার শুরু, তারপর কল্লোল বিশ্বাসের প্রবন্ধটা ওর মাথা খারাপ হতে যেটুকু বাকি ছিল, সেই ফাঁকটাও ভরাট করে দেয়। সেই থেকে একদম খেপে উঠেছে কাজটা নিয়ে।

**

মাঝের ক-টা দিন যে কোথা দিয়ে চলে গেল টেরই পেল না। এনজেপিতে নামতেই সুদীপ্ত এগিয়ে এসে ওর স্ট্রলারটা হাত থেকে নিয়ে নিল। মেঘনা এর আগেও খেয়াল করেছে, ওর প্রতি একটা অন্যরকম শ্রদ্ধাবোধ কাজ করে সুদীপ্তর ভেতর, আর সেটা ওর আচরণের মধ্যেও ফুটে ওঠে। অথচ কদিনেরই বা আলাপ! ভার্চুয়াল জগতের বন্ধু কী করে যেন ধীরে ধীরে প্রকৃত বন্ধু হয়ে উঠল! কী ঠেকা ছিল ওর মাশানের পটগুলোর কথা মেঘনাকে জানানোর! উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে বেড়ে ওঠা সুদীপ্তর মধ্যে ঈর্ষা বা সংকীর্ণতার লেশমাত্র নেই।

আসুন, আমাদের গাড়ি স্ট্যান্ডেই রাখা আছে।

প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে আসতেই চোখ জুড়িয়ে গেল মেঘনার। সামনে ঝকঝকে নীল আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা।

বাবা-মা ভালো আছেন? তোমার রিসার্চের কাজ কেমন চলছে?

বাবা-মা ভালোই, শুধু বাবার প্রেশারটা আজকাল একটু বেশি থাকছে। আর রিসার্চের ব্যাপারে নতুন করে কী বলব! সবাই যা করে, বই পড়া ফিল্ডওয়ার্ক করা, সেভাবেই চলছিল। কিন্তু, হঠাৎ করে কুশলের কাছে থেকে এইসব ইনফরমেশন পেয়ে ইস্তক আমার মনটা একদম অস্থির হয়ে আছে। জানেন মেঘনাদি, ওখানে না যাওয়া অব্দি আমি একটুও শান্তি পাচ্ছি না।

ভাড়ার গাড়ি। ড্রাইভার মনে হল নেপালি। বোলেরো গাড়ির পেছনের দরজা খুলে মেঘনার স্যুটকেস রেখে, হাসিখুশি স্বভাবের লোকবাহাদুর বলে, আপলোগ বয়েঠ যাইয়ে। তুরন্ত নিকালনা পড়েগা, নেহি তো পহছনেমে দের হো জায়েগা।

মানখিম ইঁহাসে লগভগ চার ঘন্টেকা রাস্তা। আভি নও বাজ গিয়া। আপলোগোকা নসিব আচ্ছা হ্যায়, আজ বারিষ নেহি হুয়া। নেহি তো কম সে কম পাঁচ ছে ঘণ্টা লাগ যাতা।

মেঘনার সিকিম দেখার দৌড় গড়পড়তা বাঙালি ট্যুরিস্টের মতো গ্যাংটক আর ছাঙ্গু লেক। ও সুদীপ্তর দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকায়।

মানখিম পূর্ব সিকিমের একটা গ্রাম। ওখানে একটা মনাস্ট্রি আছে, লোকে বলে আরিতার মনাস্ট্রি, পৃথিবীর প্রাচীনতম মঠগুলোর মধ্যে একটা। খুবই ছোটো, কিন্তু এত পুরোনো বলেই এখনও এত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি সিল্ক-রুটের কথা শুনেছেন তো? বলল সুদীপ্ত।

যেই রাস্তা দিয়ে আগেকার দিনে চিন বা তিব্বত থেকে ব্যবসায়ীরা এদেশে আসতো? হাতব্যাগটা ঠিক করে রেখে আরাম করে পা ছড়িয়ে বসে মেঘনা।

শুধু এদেশে নয়, এই পথ চিন, তিব্বত হয়ে জেলেপ লা, নাথু লা পাস পেরিয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে দিয়ে সোজা তাম্রলিপ্ত অব্দি চলে গিয়েছে। এক সময় অতীশ দীপঙ্কর এই পথেই তিব্বত গিয়েছিলেন। মানখিমকে এই দুর্গম সিল্ক-রুটে যাওয়ার বেস ক্যাম্প হিসেবে ধরতে পারেন। আসলে ফোনে তো সব কথা বলা হয়নি, সম্ভবও না। তারপর সুদীপ্ত একেবারে কথার ঝুলি খুলে বসেছিল।

কিন্তু বেশিক্ষণ চিন্তা করলেই মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে, কী যে ওষুধ দিল ওরা, আচ্ছন্নতা আর কাটছেই না। আবারও শুতে ইচ্ছে করছে। একটু ঘুম এই মুহূর্তে ওর ভীষণ প্রয়োজন। শরীরটা যেন ছেড়ে দিচ্ছে।

বহুদূর থেকে কথাগুলো ভেসে আসছে, সুদীপ্ত কি ফোন করেছে! এত আস্তে শোনাচ্ছে কেন কথাগুলো? মেঘনার মাথার ভেতর পাক খাচ্ছে কতগুলো শব্দ। মাশানের আদি রূপ আমরা পাই যন্ত্র বা ছবির মাধ্যমে, সুদীপ্ত বলে, এগুলি সিল্কের কাপড়ে আঁকা

হত। এখন উত্তরবঙ্গে আর এই সিল্কের কাপড়ের পটের ব্যবহার দেখা যায় না। কিন্তু আজ আপনাকে আমি সেই রেয়ার জিনিসই দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি। অবশ্য সবটাই লামাদের মেজাজ-মর্জির ওপর নির্ভর করছে। মনাস্ট্রিতে গিয়ে ওঁদের রাজি করাতে পারলে, তবেই কাজ হাসিল হবে। তবে আমার বন্ধুর সঙ্গে ওই মঠের প্রধান-লামার খুব ভালো সম্পর্ক, এটাই যা ভরসার।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মেঘনা খুব খুশি হয়েছিল সুদীপ্তর কথায়। সেই প্রথম একটা ভরসা পেয়েছিল, মনে হচ্ছিল ওর সিরিজ নিয়ে আর চিন্তার কিছু নেই। লামাদের যে করে হোক ম্যানেজ করে, পটিয়ে পাটিয়ে কাজ হাসিল করতেই হবে।

এরপর সুদীপ্ত কত বইয়ের কথা বলেছিল। বলেছিল, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বইয়ের কথা, যেখানে এক জায়গায় লেখা আছে, দশম শতকে উঠে আসা বজ্রযানী বৌদ্ধদের আরেকটা শাখা হল কালচক্রযান। এই ধারায় অনেক ভয়ংকর ধরনের দেবদেবী আছেন যাঁদের মন্ত্র, মণ্ডল ও বলিদানের মাধ্যমে তৃপ্ত করতে হয়।

মেঘনা টের পায় ওর আর সুদীপ্তর পড়াশুনো একই পথে এগিয়েছে। ও আবার সুদীপ্তকে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলার তন্ত্র' বইটার কথা বলে, যেখানে ও পড়েছে, তন্ত্রের জন্মভূমি হল বাংলাদেশ। এখান থেকেই দেশের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে এই ভাবনা। ইতিমধ্যে বাংলার লৌকিক ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান বৌদ্ধ-ধর্মের সঙ্গে বিভিন্নভাবে মিশে গেছে বা বৌদ্ধ-ধর্মকে প্রভাবিত করেছে। আবার বাংলার সনাতন ধর্মও প্রভাবিত হতে শুরু করেছে বৌদ্ধ তন্ত্রের মাধ্যমে। তন্ত্রের আশ্রয়ে বুদ্ধের শূন্যের নিরাকার আকারে রূপায়িত হয়ে ওঠে। এভাবেই বৌদ্ধধর্মে বিভিন্ন দেবদেবীর কল্পনা। মানে দেখা যাচ্ছে যে, একটা সময়ে এসে কৌম-সমাজের লৌকিক ধারা ও বৌদ্ধ নিরাকার সাধনা মিলেমিশে এক হয়ে গেছে।

যার প্রভাব যেমন বৌদ্ধ-ধর্মে পড়েছে, তেমনি সাধারণ জাতি-জনজাতির ধর্মীয় লোকাচারেও পড়েছে।

জানেন তো মেঘনাদি, আমি উত্তরবঙ্গের জাতি-জনজাতিদের এই লোকবিশ্বাসের ওপরে এক্সটেন্সিভলি ফিল্ডওয়ার্ক শুরু করেছি। মাশানশিল্পীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে আঠেরো রকমের মাশানের স্পেসিমেন কালেক্ট করা হয়ে গেছে। তারপর গেলাম গ্যাংটকে টিবেটান ইন্সটিটিউটে। ওখানকার বজ্রযানী সম্প্রদায়ের দেবদেবীর মূর্তিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে আমার মনে হয়, মাশানের সঙ্গে এই মূর্তিগুলোর ভীষণ মিল।

মাশানদেবতার মূর্তি ও ছবি দেখে, বিশেষত মাটির মূর্তির ছবি দেখে ঠিক এই কথাটাই আমারও বারবার মনে হয়েছে, মেঘনা সায় দেয়, কিন্তু যথাযথ প্রমাণ ছাড়া তো কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

তার ক-দিন আগেই আবার আপনার পাঠানো ‘পঞ্চরক্ষা’ বইটা পড়ে শেষ করেছি। ওটা কিন্তু আমার রিসার্চের কাজে সবচেয়ে বেশি হেল্প করেছে মেঘনাদি।

মেঘনারও যেন ভেতরকার আগল খুলে গেছিল সেদিন, হ্যাঁ সুদীপ্ত, আমিও পড়েছি যে একটা সময় মূল বৌদ্ধ-ধর্ম ভেঙ্গে বিভিন্ন শাখা তৈরি হতে থাকে। এদের মধ্যে একটা ধারা হল মন্ত্রযান বা তন্ত্রযান। তুমি যে কালচক্রযানের কথা বলছিলে সেটা তন্ত্রযানেরই একটা শাখা। আধ্যাত্মিক চিন্তার তারতম্য অনুসারে এর আবার আরও দুটো শাখা আছে— বজ্রযান ও সহজযান। বজ্রযানী সম্প্রদায় এই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম থেকে দশম শতাব্দীতে তৈরি হয়। সংসারি লোকেরাও এই প্রথায় সাধনা করতে পারেন, এই কারণেই এত জনপ্রিয় হয় এই ধারা। তুমি ঠিকই বলেছ এদের প্রভাব উত্তরবঙ্গের জাতি-জনজাতিদের ওপরেও পড়ে এবং হিন্দু ধর্মের সঙ্গে মিশে এক লৌকিক সংস্কৃতি তৈরি হয়। আর, সনাতন হিন্দু-ধর্মের ব্রাহ্মণ্যবাদের আক্রমণাত্মক ব্যবহারের

ফলেও বৌদ্ধ-ধর্ম প্রায় অবলুপ্ত হতে বসেছিল। এই সময় সাধারণ কৌমসমাজের সঙ্গে মিশে যেতে না পারলে, বৌদ্ধ-ধর্মের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখাই কঠিন হত।

সেদিন দুজনেই কী এক্সাইটেড ছিল, মনে হচ্ছিল, লক্ষ্যপূরণের একদম সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

জানো সুদীপ্ত, এই হয়তো আমার শেষ সুযোগ। এবার যদি মাশান নিয়ে কাজটা না করতে পারি আর ফ্রান্সে যাওয়া হবে না। মেঘনা প্রতিযোগিতার কথা বলে। সুদীপ্তর কথা শুনে অবধি, ও ভেতরে ভেতরে ছটফট করছিল, আচ্ছা, সুদীপ্ত, তোমার বাড়িতে শোলার তৈরি যে মাশানদেবতার মূর্তিগুলো দেখেছিলাম সেগুলো তো এখনকার বাজারি রং দিয়ে বানানো। কিন্তু কল্লোল বিশ্বাস সেদিন বললেন, একসময় প্রাকৃতিক রঙে মাশান তৈরি হত?

সুদীপ্ত আজ যেন আর সেই আগের মতো শান্ত চুপচাপ সুদীপ্ত নয়, একটা বাচ্চা ঘোড়ার মতো চঞ্চল হয়ে উঠেছে, ওর কথা আর থামছেই না, না মেঘনাদি, এখনও বেশ কিছু শিল্পী আছেন, যাঁরা ভেষজ রঙেই কাজ করেন। তবে সব মানুষ তো সমান না, অনেকেই ভাবেন, যখন হাতের কাছে রেডি জিনিস পাচ্ছি, কি দরকার অত খাটাখাটনির! আরও একটা ফ্যাক্টর আছে, এই শিল্পীদের জীবন খুব কষ্টের। ভেষজ রং তৈরি করতে সময় আর খাটনি দুই-ই লাগে। এদেশে তো শ্রমের যোগ্য মূল্যায়ণ হয় না। যে মানের কাজ করেন ওঁরা, সেই অনুপাতে কী মজুরি পান ওঁরা! ভেষজ রং ব্যবহার না করার এটাও একটা কারণ। সব ঠিকঠাক থাকলে আমি ফেরার পথে আপনাকে কিছু শিল্পীর বাড়ি নিয়ে যাব। এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার, এ আমাদের উত্তরবঙ্গের সম্পদ।

সব শিল্পীর জীবনই কষ্টের, দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেঘনা। যতদিন মানুষ স্রষ্টা, ততদিন যন্ত্রণা তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে রাখবে। ওর নিজের জীবনটাই তো অন্যরকম হয়ে যেত, যদি আর পাঁচজনের মতো ভোগবাদের

গড্ডালিকাপ্রবাহে ভেসে যেতে পারত, যদি একটু আপোষ করতে পারত।

সেদিন গল্পে গল্পে ওরা খেয়ালও করেনি, কতদূর এসে গেছে। জানলা দিয়ে তাকাতে চোখে পড়ল সেবক রোড পেরিয়ে ডানদিকে তিস্তা নদীকে রেখে গাড়ি আস্তে আস্তে পাহাড়ি রাস্তায় উঠতে শুরু করেছে। মেঘনার চোখ জুড়িয়ে যায়। বহুদিন বাদে কলকাতার ধুলো-ময়লা দূষণ থেকে বেরিয়ে এত সবুজ একসঙ্গে। তার ওপর বুনো ফুলের গাছ ভরে আছে ফুলে, যেন একটা সবুজ আকাশের গায়ে কেউ নানা রঙের নক্ষত্র সাজিয়ে দিয়েছে। মার্চ মাস। আশেপাশে ছোট ছোট কাঠের বাড়িগুলোর চারপাশেও মরশুমি ফুলের সমারোহ। পাহাড়ের লোকেরা ওদের ঘরবাড়ি খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে। আয়োজন সামান্য। হয়তো কটা পয়েন্টসেটিয়া, জিনিয়া, গাঁদা ফুলের গাছ, কিন্তু তার সঙ্গে ঘরের রঙিন টিনের চাল, রংচঙে পর্দা, সব মিলিয়ে দেখতে খুব ভালো লাগে।

লোকবাহাদুর অভিজ্ঞ ড্রাইভার, গাড়ি তিস্তাবাজার এসে পৌঁছোতে ওদের বলল, আপলোক যাকে কুছ চায়ে নাস্তা কর লিজিয়ে। বেশ কিছু দোকানপাট, ঘরবাড়ি মিলিয়ে এ জায়গাটা একটা ছোটখাটো গঞ্জের মতো। তিস্তা নদীর ব্রিজ পেরিয়ে চিত্রের কাছে রাস্তাটা দু-ভাগ হয়ে একটা পথ সিকিমের দিকে চলে গেছে। রংপো থেকে পশ্চিমবাংলার শেষ আর সিকিমের শুরু। এখানেই চেকপোস্ট। চারপাশের দৃশ্য দেখে মেঘনা কিছুক্ষণের জন্য কলকাতার জীবনের স্ট্রেস, শিল্পীদের ভেতরকার দলাদলি নোংরামি সবকিছু ভুলে গেল। এর আগেও ও দেখেছে সিকিমের মতো ঘন সবুজ গাছপালা আর কোথাও দেখা যায় না, অন্তত ওর জীবনে ও দেখেনি। নাগরিক দূষণ যেন এ রাজ্যকে ছুঁতে পারেনি।

চমক ভাঙল সুদীপ্তর কথায়। জানেন তো তুর্কি আক্রমণের সময় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল

বৌদ্ধবিহারগুলো? একদিকে সেন রাজাদের সময় বিশেষত বল্লাল সেনের আমলে হিন্দুদের কুল শীল জাতিপ্রথা সবকিছুকে আবার ঢেলে সাজানো হয়। সেসময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদ এতটাই তীব্রভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল যে জাত পাত ছোঁয়াছুঁয়ির কারণে সমাজে নিম্নবর্গের মানুষেরা অচ্ছুতের মতো থাকত। এর ফলে প্রচুর মানুষ বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রহণ করে। আর সেই যে বলছিলাম, এর মধ্যে হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের প্রভাবে বৌদ্ধ-ধর্মের মধ্যেও মূর্তিপুজো, তন্ত্রসাধনা এসব ঢুকে যেতে থাকে। তার ফলে বৌদ্ধরাও বিভিন্ন শাখায় ভেঙে যায়। মহাযান, হীনযান ও বজ্রযান এই তিনরকমের বৌদ্ধ সাধনপদ্ধতি চালু হয়ে যায়। আবার এই তিনরকম মতবাদের ফলে বৌদ্ধদের মধ্যেও একতা নষ্ট হয়ে যায়। দেশের রাজা তখন বৃদ্ধ, অশক্ত লক্ষ্মণ সেন। বিশাল সাম্রাজ্যের চারিদিকে অরাজকতা। এই সুযোগে তুর্কিরা ভারত আক্রমণ করে বসে। বৌদ্ধবিহারগুলি ছিল তৎকালীন ভারতবর্ষে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার পীঠস্থান। তুর্কিরা বুঝেছিল এগুলিকে শেষ না করলে ভারতবর্ষকে সম্পূর্ন করায়ত্ত করা যাবে না।

এটা অবশ্য পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকালেও দেখা যায়, যে কোনও যুদ্ধে মানুষই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, শিক্ষা সংস্কৃতির ওপরেও বিরাট আঘাত পড়ে, মেঘনা সায় দেয়, কবে যে এসব হানাহানি বন্ধ হবে! হয়তো হবেই না, যতদিন সভ্যতা বেঁচে থাকবে ততদিন মানুষে মানুষে এই রেষারেষি চলতেই থাকবে।

ওই দেখুন ফুলঝাড়ুর গাছ, লোকবাহাদুর ওদের কথার মাঝখানেই জানলা দিয়ে দেখায়, একে আমরা বলি 'অমলিশো'।

ওয়াও, মেঘনা বলে, সেই ছোটবেলায় পাহাড়ে বেড়াতে এসে দেখেছিলাম, কিন্তু নামটা জানতাম না। একটু দাঁড়াবেন ভাইয়া, একটা ফোটো নিয়ে নিই।

সুদীপ্তকে সত্যিই আজ কথায় পেয়েছে, মেঘনা গাড়িতে এসে বসার পর ও আবার

শুরু করে, জানেন ওরা হাজারে হাজারে পুথি জ্বালিয়ে দিয়েছিল, নালন্দা, বিক্রমশীলের মতো বড়ো বড়ো বিহারগুলোকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের কচুকাটা করে এমনকি আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিল। সেকারণে এই সময়ে এদেশের বিহারগুলির আচার্যরা পুথি ও অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ তুর্কিদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তিব্বতের মঠগুলিতে পাঠিয়ে দেন। শ্রীজ্ঞান অতীশও এই সময় তিব্বত চলে যান। সব মিলিয়ে তিব্বত সে সময় বৌদ্ধধর্মের প্রচার এবং প্রসারে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। আবার তিব্বতের প্রচীন 'বোন-পা' ধর্মের তন্ত্র মন্ত্র, এগুলোও বৌদ্ধ-ধর্মের সঙ্গে মিশে যায়। বৌদ্ধ-ধর্মের এই মিশ্রিত রূপ আবার ভারতের ধর্মকেও প্রভাবিত করে।

দাঁড়াও দাঁড়াও, বোন-পা ধর্ম কি? আমি এই ধর্মের কথা তো শুনিনি, মেঘনা অবাক হয়ে ভাবে, কত কী যে জানতে হচ্ছে!

প্রাক বৌদ্ধ যুগে তিব্বতে এক প্রাকৃতিক ধর্ম খুব প্রসার পেয়েছিল, তাকেই বলা হয় 'বোন-পা' ধর্ম। এই 'বোন' পন্থীরা কিছুটা ব্রাহ্মণ্য শৈবতন্ত্রের মতো পরমেশ্বর ও শক্তির উপাসনায় বিশ্বাস করত এবং অলৌকিক শক্তি অর্জন করার জন্য সাধনা ও ক্রিয়া করাকে বিশেষ প্রধান্য দিত। তাদের মতে, জীবের প্রাণস্পন্দন হল মহাশূন্যের খণ্ড প্রকাশ এবং 'বোনকায়' জীবের অন্তরেই বিরাজ করেন। এই ধর্মই বৌদ্ধ-ধর্মকে প্রভাবিত করেছিল। এই ধর্মের সাধনা ও ক্রিয়াপদ্ধতি বৌদ্ধ-ধর্মের মধ্যেও ঢুকে গিয়েছিল।

আচ্ছা! মেঘনা বলে, ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায়ের থিসিস পেপার পড়তে পড়তে আমি একটা নতুন তথ্য পেয়েছি, উনি বলেছেন মাশানই শিব। সেটা মেনে নিলে কিন্তু একদম এস্টাবলিশড্ হয়ে যাচ্ছে যে, একসময়ে পুরাণের সঙ্গে লৌকিক ধর্মবিশ্বাস মিলেমিশে গেছে। আবার বৌদ্ধ-ধর্মের মহাকালও তো শিবই।

ঠিক বলেছেন, এই মহাকালের ছবি দেখলেই দেখবেন কী মিল মাশানদেবতার মূর্তির সঙ্গে।

কোচবিহারে তো মাশানের মাটির মূর্তি দেখা যায়, মেঘনা বলে, আমি নেটে ছবি পেয়েছি। তার সঙ্গে আমাদের পুরাণের শিবঠাকুরের মূর্তির কিন্তু খুব মিল। বিশেষত বেশ কিছু মাশানপাটের ছবিতে এই লোকদেবতার গায়ের রং নীল, যেটা তুমি বেশিরভাগ সময়েই শিবের মূর্তিতেও পাবে। আবার ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায় এ-কথাও বলেছেন, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা ও মেখলীগঞ্জে যেসব মাশানদেবতার খোঁজ পাওয়া যায়, তাঁদের প্রকৃতি আলাদা। এই শিবের সঙ্গে তাঁদের কোনও মিল নেই। কিন্তু উনি নিজে মাশানদেবতাকে শিব বলেই মেনে নিয়েছেন।

একদম ঠিক ধরেছেন, সুদীপ্ত বলে, কোচবিহার জেলার পুজোর ইতিহাস সম্পর্কে পড়লে দেখতে পাবেন, আলোকঝাড়ি গ্রামে মাশানঠাকুরের পুজোর মন্ত্র সংস্কৃত ভাষায়। সেখানে আবার মাশানকে কুবের বলা হয়েছে। আবার কুবেরের অন্য নাম যক্ষ, যার থেকে উত্তরবঙ্গের যখা ঠাকুরের নাম। রাজবংশী সমাজের ধারণায় যখাঠাকুরই শিব। দিদি সব কথা বলতে গেলে একেবারে মহাভারত হয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে রংগলি ফরেস্ট অফিস এসে গেছে। লোকবাহাদুর গাড়ি দাঁড় করায়। এখান থেকেই পূর্ব সিকিমের বনাঞ্চলে যাওয়ার পারমিট নিতে হয়। এখানেই সুদীপ্তর বন্ধু কুশলের সঙ্গে মেঘনার প্রথম আলাপ। ও বেশ করিতকর্মা ছেলে। পারমিটটা আগেভাগেই তৈরি করে রেখেছিল, ফলে সময় নষ্ট হল না। কিন্তু কুশল এখনই ওদের সঙ্গে যেতে পারবে না। অফিসে জরুরি কাজ আছে। বিকেলের দিকে যাবে।

হোম-স্টেটাও কী দারুণ ছিল! ঠিক কার্টুন চ্যানেলের বাড়িগুলোর মতো দেখতে। ঘরে ঢুকে মেঘনা সবকটা জানলা খুলে দিতেই চোখ মন

দুইই ভরে গিয়েছিল। সিকিম তার সবুজ কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে পাহাড়ের গায়ে। আসার পথেই একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে মেঘনা, এখানে চাষবাস, দোকান-পাট চালানো সবকিছুতেই মেয়েদের প্রাধান্য। খেতে বেশিরভাগ মেয়েরাই চাষ করছে। কেউ ফসল তুলে পিঠে বেঁধে নিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছে। মেঘনার মন ভালো হয়ে যায়, পরিবেশের কারণেই হোক বা নিজের কাজের ব্যাপারে একটা নতুন দিশা দেখতে পেয়েই হোক, টের পায় এত দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি সত্ত্বেও বেশ ফুরফুরে লাগছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা বাচ্চা ছেলে এসে খাবার জন্য ডাকল। গরম গরম ভাত ডাল স্কোয়াশের তরকারি ডিমভাজা, খিদের মুখে তাই অমৃত বলে মনে হল। সে একটু বেশিই খেয়ে ফেলল। মালিক রবিন রাই আর ওর পরিবারের লোকেরা মিলে এই হোম-স্টেটা চালায়।এই ক-দিনেই ওদের সঙ্গে একটা আত্মীয়তা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। পাহাড়ের মানুষ কত আন্তরিক!

মেঘনা, সুদীপ্ত কারোরই আর তর সইছে না, কতক্ষণে মনাস্ট্রিতে যাবে, পটগুলো দেখবে, তার জন্য দুজনেই অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল। কুশল এত দেরি করছে কেন! ওদের হাতে সময় খুবই কম, আজই মনাস্ট্রিতে যেতে হবে।

কুশলের সঙ্গে সুদীপ্তর আলাপ এবং বন্ধুত্ব ইউনিভার্সিটিতে পড়তে গিয়ে। ফরেস্টসার্ভিসের পরীক্ষা দিয়ে কুশল বছর দুয়েক হল জয়েন করেছে রংগলির অফিসে। কুশল আসতেই ওরা মনাস্ট্রির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। লোকবাহাদুরকে এখন পাওয়া যাবে না, সারাদিন গাড়ি চালানোর পর ওর এখন ছুটি। ওরা কুশলের জিপে উঠে বসল।

মনাস্ট্রিটা দেখে একটু হতাশই হয় মেঘনা। বড্ড ছোটো। ও এর আগে রুমটেক মনাস্ট্রি দেখেছে, তার তুলনায় এটা যেমন আয়তনে ছোটো, তেমনই চেহারা-ছবিতেও ম্যাড়ম্যাড়ে। চার-পাঁচ কাঠা মতো জায়গায় পুরো মঠটা ধরে গেছে। একটা বিস্তৃত চাতাল পেরিয়ে

মূল উপাসনাঘর আর দুপাশে আবাসিক লামাদের থাকার ছোট ছোট সারিবাঁধা কুঠরি। ঢোকার মুখেই প্রায় দুইমানুষ সমান উঁচু একটা মণিচক্র। তার গায়ে বিভিন্ন সংকেতচিহ্ন উজ্জ্বল রঙে আঁকা, তিব্বতি অক্ষরে কিছু শব্দ লেখা। মেঘনা মোবাইল বের করে ছবি তুলতে যেতেই কুশল বলে, এসব পরে হবে, আগে লামাজির সঙ্গে দেখা করে আসি। উই আর অলরেডি লেট, এরপর প্রার্থনার সময় হয়ে গেলে আজকে আর ওঁর সঙ্গে কথাই বলা যাবে না।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আর বলতে! এর জন্যই তো এতদূর থেকে ছুটে ছুটে আসা, সুদীপ্ত বলে।

এদিক দিয়ে আয়, কুশল সোজা গিয়ে উপাসনাঘরের পেছনের সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে গেল। সেখানে আবার আরেক ঝামেলা। মেঘনার জানা ছিল না, বহু মূল্যবান জিনিসপত্র থাকে বলে, এইসব মঠ পাহারা দেওয়ার জন্য হিংস্র কুকুর পোষা হয়। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই কয়েকটা পাহাড়ি কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এসে মেঘনা আর সুদীপ্তর গা শুঁকতে শুরু করল। একটা কুকুর তো মেঘনার গায়ে সামনের দুটো পা ছড়িয়ে দিয়ে প্রায় বুকের কাছে মুখ নিয়ে এসে জিভ বের করে হাঁ হাঁ করে নিঃশ্বাস ফেলছে। ছোটোবেলায় একবার কামড় খেয়ে চোদ্দটা ইঞ্জেকশন নিতে হয়েছিল। সেই থেকে মেঘনা কুকুর দেখলেই প্রচণ্ড ভয় পায়। আতঙ্কে ও পুরো পাথর হয়ে যায়, মুখ দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরোয় না। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, কুশল ওর পকেট থেকে কিছু বিস্কুট বের করে কুকুরগুলোর সামনে ছড়িয়ে দিতেই ওরা যেন মেঘনাদের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে শান্ত হয়ে খাবারের দিকে মন দিল। মেঘনাও ছাড়া পেয়ে ধীরে ধীরে সমে ফেরে, ভাবে, যাক বাবা, এরপর থেকে যদি এখানে আসি, আর কিছু করি না করি অন্তত প্যাকেট ভর্তি বিস্কুট নিয়ে আসব।

ছাদে মঠের প্রধান আচার্য রিনচেন লামার ঘর। কুশল গিয়ে সেই ঘরের দরজায় টোকা দিল। দরজা

খোলাই ছিল। লামাকে দেখলেই বোঝা যায় অনেক বয়েস হয়েছে। সারা মুখে অজস্র বলিরেখা, দাড়ি না থাকলেও ওপরের ঠোঁটের দুপাশ থেকে সরু গোঁফের রেখা ঝুলে আছে। প্রসন্ন মুখে ওদের বসার জন্য আসন দেখিয়ে দিলেন। এতদিন অব্দি মেঘনা এইসব মনাস্ট্রিতে ট্যুরিস্টের মতো বেড়াতে এসেছে, দু চারটে ছবিটবি তুলে, ঘুরেফিরে চলে গেছে। এখানকার রীতিরেওয়াজ সম্পর্কে কোনও ধারণাই তৈরি হয়নি। ও প্রথমে একটু সিঁটিয়েই ছিল, কে জানে এইসব লামাটামারা সাধারণ মানুষদের কী চোখে দেখবেন! কিন্তু লামার ব্যবহারে ওর জড়তা কেটে যায়। ও ভাবতেই পারেনি এত উচ্চপদস্থ একজন মানুষ এমন আন্তরিকভাবে আপ্যায়ন করবেন।

ওরা লামাকে প্রণাম জানিয়ে মেঝেয় পাতা আসনে হাঁটু মুড়ে বসল। কথাবার্তা সব হিন্দিতেই হচ্ছিল, এটাই যা সুবিধের। নেপালি বা অন্য ভাষা হলে মেঘানা বা সুদীপ্ত ফাঁপরে পড়ে যেত। যা বোঝা গেল, কুশলের সঙ্গে লামার বেশ ভালোই পরিচয় আছে।

আপনি সেদিন আমাকে যে-পটগুলো দেখিয়েছিলেন, আমি এদের সেগুলোর কথা বলেছি। উনি বিখ্যাত পেইন্টার মেঘনা সান্যাল আর এ আমার বন্ধু সুদীপ্ত ঘোষ। ওঁরা এই প্রাচীন শৈলীর বিষয়ে খুব আগ্রহী, আমার কাছে সব কথা শুনে ওঁরা পটগুলো দেখার জন্য এসেছেন, কুশল বলল।

দেখ কুশল, তুমি এখানকার সরকারি অফিসার, তার ওপর গত দু বছর ধরে তোমাকে দেখছি, চিনি, জানি। তাই ওই পটগুলো তোমাকে দেখিয়েছি। এগুলো খুবই দুর্লভ বস্তু। যে কারণে এগুলো আমাদের উপাসনাঘর বা গ্রন্থাগারে না রেখে, আমার ঘরে রেখেছি। যতদূর জানি এই পটগুলো প্রায় সাত আটশ বছরের পুরোনো। কথিত আছে, তুর্কিদের আক্রমণের সময় গুরু পদ্মসম্ভবের সঙ্গে আরও অনেক মূল্যবান পুথিপত্রের সঙ্গে এই পটগুলো

তিব্বতে চলে গিয়েছিল। এগুলো সবার সামনে বের করার অনুমতি নেই, রিনচেন লামা বললেন।

লামাজি, এঁরা অনেক আশা করে এসেছেন, বিশেষত এই ম্যাডাম সেই কলকাতা থেকে ছুটে এসেছেন, শুধু এগুলো একবার দেখবেন বলে, কুশল বলল।

ঠিক আছে, তুমি যখন এত করে বলছ আমি দেখাচ্ছি, তবে শহরের লোকেদের একটা খারাপ অভ্যেস আছে, ওরা এখানে বেড়াতে এসে যা দেখে, তারই ছবি তোলে। আমি কিন্তু এগুলোর ছবি তুলতে দেব না, লামা বললেন।

না না , ছবি তোলার প্রশ্নই ওঠে না, সুদীপ্ত হাত দিয়ে মুখের থেকে কাল্পনিক ঘাম মোছে। ভেতরের উত্তেজনা সে আর চেপে রাখতে পারছে না।

এবার লামা তাঁর খাটের নিচ থেকে টেনে একটা বাক্স বের করলেন। ঠিক এই সময়েই দরজার বাইরে খুট করে একটা শব্দ হতেই রিনচেন লামা সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর চিবরের এক প্রান্ত দিয়ে বাক্সটা আড়াল করতে করতে বলে উঠলেন, কে?

কুশল এক লাফে দরজার বাইরে বেরিয়ে সন্ধানী দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়েও কাউকে দেখতে পেল না।

ও কুকুর-টুকুর কিছু হবে, কুশল লামাকে আশ্বস্ত করে।

বাক্সটা বহু পুরোনো, কী কাঠের, তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে ওপরে খুব সুন্দর কারুকার্য। দুটো ড্রাগন প্রতিস্পর্ধি ভঙ্গিতে একটা সাপকে আক্রমণ করছে।

এই পটগুলো গত মাসেই তিব্বতের এক মঠ থেকে এসেছে— লামা বললেন। আচার্য রিনচেন বাক্সের ডালা খুলে কাপড়ের একটা পুঁটলি বের করলেন। মোড়ক খুলতেই ওদের চোখ বিস্ময়ে কপালে উঠে গেল। কম করে আট দশখানা পট, সবকটা মোটামুটি আট ইঞ্চি মতো চওড়া, লম্বায় ইঞ্চি বারো হবে। সিল্কের কাপড়ের ওপর আঁকা, অনেকটা বৌদ্ধদের

থাংকার মতো দেখতে, তার ওপর প্রাকৃতিক রঙে সব ছবি। সুদীপ্তর অভিজ্ঞ চোখ ছবিগুলো দেখেই বুঝতে পারে এগুলো মাশানের পট। সেই কবেকার আঁকা ছবি, অথচ রং এখনও কী উজ্জ্বল! পটগুলিতে অনেকটা মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গলের পটের মতো বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে কোথাও দেবমাহাত্ম্য বোঝানো হয়েছে, আবার কোথাও মাশান ভর করা মানুষের ছবি, কোথাও বা কীভাবে মাশান ভর করে আর কীভাবেই বা তাকে তুষ্ট করে মানুষকে উদ্ধার করা হয়, তার বর্ণনা।

সুদীপ্ত উত্তেজিত হয়ে বলে, দিদি, অ্যাপারেন্টলি এগুলো দেখে তো মনে হচ্ছে সত্যিই অন্তত সাত আটশ বছরের পুরোনো। অবশ্য যদি ল্যাবে নিয়ে টেস্ট করা যেত, তাহলে একজ্যাক্ট সময়টা বোঝা যেত। তবে আমার যদ্দুর মনে হচ্ছে, আমাদের উত্তরবঙ্গে যেরকম তিস্তাবুড়ির গান বা বিষহরার গান প্রচলিত আছে, তেমনই হয়তো একসময় এইসব পট সামনে রেখে মাশানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হত।

উফফ, আমার না ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে, সুদীপ্তর উত্তেজনা মেঘনার ভেতরেও চারিয়ে যায়।

এই যে নদীর ঘাটের কাছে বসে আছেন, ইনি তিসিলা মাশান, জলে থাক্কেন, ভর দুপুরে বা সন্ধে বেলায় কাউকে সামনে পেলে ভর করেন। আশ্চর্য ব্যাপার কিন্তু, 'তি' মানে বোড়ো ভাষায় জল। অথচ এই পটগুলো তিব্বতের মনাস্ট্রি থেকে এসেছে। আর উত্তরবঙ্গের লোকদেবতার ছবিও তিব্বতের মঠ অব্দি পৌঁছে গিয়েছিল মানে ভাবুন, সংস্কৃতির কী আশ্চর্য আদানপ্রদান হয়েছিল সে সময়ে! নাকি সেই যেমন ইউরোপের রেনেসাঁর সময় বাইজেন্টাইন স্কলাররা সব মূল্যবান স্ক্রিপ্ট পশ্চিম ইউরোপে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলেন, এটাও সেরকমই কোনও ব্যাপার! আর, এই দেখুন, এই যে গাছে বসে আছেন, ইনি হলেন

কুহুলীয়া মাশান। উত্তরবঙ্গে আমরা স্থানীয় লোকেরা কোকিলকে বলি কুহুলী।

হ্যাঁ, এঁর কথা আমি গিরিজাশঙ্কর রায়ের বইতে পড়েছি। এই মাশান কোকিলের মতো মিষ্টিসুরে ডেকে মানুষকে পথ ভুলিয়ে দিয়ে বিপদে ফেলেন। এই যে চলান মাশান, আর ওই নদীতে ভেসে যাওয়া কলাগাছের ওপর বসে আছেন, উনি বহিতা মাসান। এভাবে একেকটা পট ধরে ধরে বর্ণনা করতে থাকে সুদীপ্ত।

মেঘনা গভীর মনোযোগে সব শোনে, ছবিগুলোকে অনুসরণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু এটাও বুঝতে পারে, শুধু এভাবে চোখের দেখা দেখে আদতে কিছু কাজের কাজ হবে না। হয় ছবি তুলে নিতে হবে, নইলে অন্তত স্কেচ করে নিতে হবে। নিতেই হবে। শুধু স্মৃতির ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে চলবে না। এমনিতেই কত জরুরি কথা ভুলে যায়, আর এখানে তো একটা পয়েন্ট মিস করে গেলেই সব গন্ডগোল হয়ে যাবে। কিন্তু রং! ও আচার্যর কাছে জানতে চায় কীভাবে এই রং তৈরি করা হয়।

আমরা বিভিন্ন গাছের পাতা, ফুল, ছাল, পাথর, মাটি থেকে এসব রং তৈরি করি। এ অনেক সাধনা, অনেক পরিশ্রমের ব্যাপার। একদিন শুনে তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না।

লামাজি, আপনি আশ্রয় দিলে, আমি কিছুদিন এখানে থেকে কাজ শিখতে চাই, মেঘনা বলে।

এখানে তো কোনও মহিলাকে থাকার অনুমতি দেওয়া যাবে না, লামা বললেন।

না না, আমি মঠে থাকার কথা বলছি না, হোমস্টেতেই থাকব, আর রোজ এখানে এসে কাজ শিখব, মেঘনা মরিয়া, ওকে জানতেই হবে। কিন্তু কীভাবে? নিজের প্রশ্নের কাছে নিজেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।

মনাস্ট্রির বৈকালিক প্রার্থনার ঘন্টা বেজে ওঠে। এবার ওদের উঠতেই হয়।

যদি অনুমতি দেন কাল আবার আসব, সুদীপ্ত বলে। লামা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়েন, তবে দেখো বাপু, এসব কথা কিন্তু কাউকে বলবে না, এমনকি এই মঠের কোনও লোককেও না।

এরকম দুর্লভ সব পট মনাস্ট্রির অন্ধকারেই পচে মরবে, কোনও মানে হয়? ওখান থেকে বেরিয়েই সুদীপ্ত বলে, একটা ছবিও তুলতে দেবে না। যাচ্ছেতাই। ছবি পেলে আমার রিসার্চ পেপারের ডিকশনটাই বদলে যেত।

দাঁড়াও, লামাকে রাজি করাতেই হবে, নইলে আমার কাজও তো হবে না, মেঘনা বলল। কিন্তু কীভাবে ওঁর মন গলাবে, শত ভেবেও কোনও বুদ্ধি বের করতে পারে না। তবে রং তৈরির কৌশল শিখতেই হবে। ছোটবেলা থেকেই বাবার বদলির চাকরির সুবাদে পাঞ্জাব হরিয়ানা অঞ্চলে বেশ কিছু বছর কাটিয়েছে। আর এই প্রবাসের দিনগুলো তাকে ওদিককার মেয়েদের মতোই জেদি আর লড়াকু করে দিয়েছে। পটগুলো, নইলে ওগুলোর ছবি ওর চাই-ই চাই।

আমার কাছে কিন্তু একটা বই আছে, যাতে এই প্রাকৃতিক রং তৈরির বিষয়ে প্রচুর তথ্য আছে, কুশল বলে।

আমাকে বইটা দিতে পার, আজই? মেঘনা বলল।

সার্টেনলি। কিন্তু ওটা তো আমার অফিসের লাইব্রেরিতে আছে। তাহলে এক্ষুনি রওনা দিতে হয়। সন্ধে হয়ে এল বলে।

এবার কুশলের অফিসের পথে জিপ ছুটে চলে। আবার রংগলি গিয়ে ফিরে আসতে হবে, কমসে কম এক দেড় ঘণ্টার মামলা, কুশল ড্রাইভারকে তাড়া লাগায়। অবশেষে বইটা নিয়ে যখন আবার মানখিমের দিকে রওনা হল, ততক্ষণে ঘড়ির কাঁটা সাড়ে পাঁচটা ছাড়িয়ে গেছে। পাহাড়ি গাছগুলোর গায়ে শেষবেলার রোদ একটু আলো দেখিয়েই ঘরে ফিরে যাচ্ছে। হোমস্টেতে পৌঁছতে পৌঁছতে সাড়ে ছটা বেজে

গেল। ঘরে ঢুকে জুতো জামা বদলে হাতমুখ ধুতে গিয়ে মেঘনা দেখে জলে আর হাত দেওয়া যাচ্ছে না। বরফের মতো ঠান্ডা। গিজার অন করে ও ল্যাপটপটা চার্জে বসায়।

হাতমুখ ধুয়ে উঠতে না উঠতেই ঘরে গরম গরম পকোড়া আর চা এসে গেল। রবীন রাইয়ের এখানে ব্যবস্থা বেশ ভালো। সুদীপ্তর সঙ্গে বসে চা-পানের সময় মেঘনার মুখ থমথমে, তাহলে এতদূর আসা কি বৃথা যাবে? কোনও ছবিই যদি নিতে না পারি, এইসব দুষ্প্রাপ্য পটগুলো মনাস্ট্রির ভেতরে বছরের পর বছর থেকে যাবে আর আমরা বোকার মতো খালি হাতে বাড়ি ফিরে যাব?

আমার তো আসাটাই বেকার হয়ে গেল। আপনি শিল্পী মানুষ, আপনার চোখে দেখেও অনেকখানি কাজ হবে, কিন্তু আমি যদি অন্তত দুটো একটা ছবিই না তুলতে পারি, শুধু শুকনো তথ্য দিয়ে রিসার্চপেপারে কিছুই প্রমাণ করা যাবে না, কেউ মানবেই না। যদি তান্ত্রিক বৌদ্ধ-ধর্মের দেবদেবীদের আর মাশানের পটগুলোর ছবি নিয়ে কম্পারেটিভ স্টাডির একটা আলাদা চ্যাপ্টার রাখতে পারতাম, আমার পেপারটা ইন্টারন্যাশনাল সার্কেলে একটা সেনসেশন তৈরি করত। কত আশা করে এতদূর থেকে ছুটে এলাম, কাজের কাজ কিছুই হল না, সুদীপ্তকেও হতাশ দেখায়।

এত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র আমি নই। তোমার যদি মনে হয়, তুমি ফিরে যাও সুদীপ্ত, আমি এখন কদিন এখানেই থাকব। বাই হুক অর ক্রুক লামাজিকে পটাতেই হবে, আমি অন্তত কিছু স্কেচ না করে এখান থেকে নড়ছি না। তা ছাড়া কুশলের বইটা দেখতে হবে, আর লামা যদি একান্তই রাজি না হন, তাহলে আশপাশে খোঁজ করতে হবে, কেউ এই প্রাকৃতিক রং তৈরি করতে জানে কি না। এই সাবজেক্ট নিয়ে ছবির সিরিজ করতে গেলে আমাকে ভেষজ রং বানানো শিখতেই হবে, আজকে পটগুলো দেখে আমি আরও

বেশি করে বুঝতে পারছি, অন্য মিডিয়ামে কাজটা ঠিকমতো জমবেই না, বলল মেঘনা। আসলে ছবির ক্ষেত্রে রং একটা ভীষণ ইমপর্ট্যান্ট ব্যাপার। বিশেষত যেসব ছবির সঙ্গে মাইথোলজি, আই মিন পুরাণ, ইতিহাস বা লোকসংস্কৃতির উপাদান জড়িয়ে আছে, সেসব ছবির ক্ষেত্রে একটা ভাইটাল ব্যাপার হল রং। যেমন ধরো শিব বা বিষ্ণুর ছবি যদি দ্যাখো, দেখবে আকাশী নীল রঙে আঁকা। এই নীলের ব্যাবহার আসলে তাঁদের অস্তিত্বের অসীমতাকে বোঝানোর জন্য। আবার হনুমান বা গণেশের ছবিতে দেখবে লাল রঙের ব্যবহার, যেটা তাঁদের তেজ বা শক্তির প্রতীক। আবার আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি অনুসারে লাল রং হল উর্বরতার প্রতীক। কালী ঠাকুরের কালো রং কিন্তু কোনও রঙের অনুপস্থিতি বা অন্ধকার বোঝাতে নয়। এখানে সবকটা রং মিশে এই কালো সৃষ্টি হয়েছে। আসলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবরকম শক্তির মিশ্রণে এক অসীম শক্তির প্রকাশ এই কালো রং। তুমি খেয়াল করে দেখো, এই রংগুলো মাশানের মূর্তিতেও ব্যবহার করা হয়েছে। এই পরম্পরাগত ব্যাপারটা আমার ছবিতে ধরতে হবে। ওয়াটার কালার বা অ্যাক্রেলিক ব্যবহার করতেই পারি, কিন্তু সেই অরিজিনাল টাচটা নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে বুঝতেই পারছ, আমার এই রং তৈরি করতে শেখা কতটা জরুরি!

সুদীপ্ত হ্যাঁ-না কিছুই বলে না। ওকে একটু গম্ভীর দেখাচ্ছে। কিছু একটা ভাবছে, কিন্তু প্রকাশ করছে না, আমি ঘরে যাই দিদি, রাতের খাবার দিলে ডাকব।

সুদীপ্ত চলে যেতে মেঘনা কুশলের দেওয়া বইটা খুলে বসে। বেশ পুরোনো বই। পাতাগুলো লালচে হয়ে এসেছে, মড়মড় করছে। ও খুব সাবধানে পরপর পৃষ্ঠা উলটে যেতে থাকে— এক সাহেবের লেখা, প্রাচীন ভারতের ছবিতে ব্যবহৃত ভেষজ রং নিয়ে। মেঘনার খুব আশ্চর্য লাগে এটা ভেবে যে, ভারতবর্ষের

লোকেরা ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভূগোল নিয়ে যত না লেখালিখি করেছে, তার চাইতে অনেক বেশি লিখেছে এই সাহেবগুলো। অথচ হিসেব করে দেখতে গেলে একেকজন সাহেব আর জীবনের কটা বছর কাটিয়েছে এদেশে! ওরা তো স্রেফ চাকরি করতে এসেছিল ভারতে। অথচ ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতিকে আবিষ্কার করার ক্ষেত্রে ওদের অবদান অস্বীকার করা যায় না।

বইটা পড়তে পড়তে মেঘনা অবাক হয়ে যায়। একেবারে শুরুর সময়ে এই ভেষজ রঙের ব্যবহার ছিল মোনোক্রম বা একমাত্রিক । শুধু মাটি বা কাঠকয়লা অর্থাৎ চারকোলের সঙ্গে জীবজন্তুর শরীরের চর্বি বা লালার মতো বাইন্ডার মিলিয়ে তৈরি হত সেই রং। এরপর শুরু হয় ক্লে অকারের ব্যবহার, যা মূলত ফেরিক অক্সাইড এবং বালি ও পলিমাটির এক মিশ্রণ। বালি ও পলিমাটির অনুপাতের তারতম্য অনুসারে এই রঙে মানুষ পায় হলুদ, বাদামি বা লালের বিভিন্ন শেড। এ ছাড়াও পাথর, জীবজন্তুর হাড়, শামুকের খোল এইসব থেকেও আরও বিভিন্ন শেড আবিষ্কার করে মানুষ। পোড়া হাড় থেকেও কালো রং বের করে আনা হত, যাকে বলে বোন ব্ল্যাক। একটা জায়গায় এসে সম্পূর্ণ থ খেয়ে যায় মেঘনা। প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানুষের প্যালেটে সম্বল বলতে ছিল মাত্র তিনটে রং, লাল, কালো আর হলুদ। আরে বাহ, এই লাল আর কালো রং তো মাশানের শোলার মূর্তিতে খুব বেশি করে ব্যবহার করা হয়েছে। মাথা পুরো ভোঁ ভোঁ করতে থাকে। মেঘনা ভাবে, এই বইটা যদি ফোটোকপি করে নেওয়া যেত! মাত্র এই কটা দিন হাতে, এর মধ্যে ও কোন কাজটা করবে, মাশানের পটগুলো থেকে স্কেচ করা, না রং তৈরি শেখা, না এই বই থেকে নোট নেওয়া। পাগল পাগল লাগে। কিন্তু নাহ, আজ আর বেশিক্ষণ পড়া যাবে না। বড্ড ক্লান্ত লাগছে। এইটুকু সময়ের ভেতর এত কিছু করতে হল, মাথা আর নিচ্ছে না।

জ্যাকেটটা পরে নিয়ে বাইরে বেরোল মেঘনা। চমৎকার জ্যোৎস্না। বোধহয় সামনেই পূর্ণিমা। চারদিকের পাহাড় এই স্তিমিত আলোর ভেতর শোকস্তব্ধ মানুষের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। পায়ে পায়ে একটু এগোতেই রবীন রাইয়ের সঙ্গে দেখা—দিদি, এই সামনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেই একটা ভিউ পয়েন্ট আছে, এই জ্যোৎস্নারাতে ওখান থেকে লামপোখরি লেক দেখতে খুব সুন্দর লাগে।

এই লেকটার কথা লোকবাহাদুরও বলছিল। মেঘনার মধ্যে একটা কৌতূহল কাজ করে। রবীনের দেখিয়ে দেওয়া পথ ধরে উঠতে থাকে। বেশ অনেকগুলো সিঁড়ি। তবে ওর ট্রেকিংএর অভ্যেস আছে বলে এটুকু সিঁড়ি ভাঙা বিশেষ গায়ে লাগে না। ভিউ পয়েন্টটাতে পৌঁছে মুগ্ধ হয়ে যায় মেঘনা। অনেক নিচে লামপোখরি লেক জ্যোৎস্নার মায়ায় অপার্থিব দেখাচ্ছে। ও কিছুসময়ের জন্য ভুলে গেল, ও কে, কেনই বা এসেছে এই পাহাড়ে। ভুলে গেল কলকাতার জীবন, ওর ছবির সিরিজ, বেঁচে থাকার সংগ্রাম। এখন শুধু এই চারপাশের ধ্যানস্থ বুদ্ধের মতো পাহাড় আর পাইনবনে ঘেরা এই লেক ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নেই, কিছু নেই। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ও দাঁড়িয়েছিল লোহার রেলিংএ ভর দিয়ে। কত সময় চলে গেছে ওর হুঁশ নেই।

রাতে খেতে বসে কেউই বিশেষ কিছু বলছে না। সারাদিনের ধকলের পর এখন বিছানায় যেতে পারলেই বাঁচে।

পরদিন থেকে শুরু হল কঠিন পরিশ্রম। কুশলকে দিয়ে ওরা আচার্যর কাছ থেকে অনুমতি করিয়ে নিল পটগুলির ছবি আঁকার। উনি প্রথমে খুবই আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু ওদের জেদের কাছে হার মানতে বাধ্য হলেন। মেঘনা একটা করে পট নিয়ে তার স্কেচ করছে, আর সুদীপ্ত সেই মাশান সম্পর্কে নোট নিচ্ছে, এভাবে কাজ চলতে থাকে। একেকটা পটের জন্য গোটা একটা দিন চলে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে ওই মঠেরই এক শ্রমণের কাছ থেকে মেঘনা প্রাকৃতিক উপায়ে রং তৈরি করা শিখতে শুরু করে দিয়েছে। ওংলিং লামা এই মঠেরই একজন পুরোনো শ্রমণ। ছোটোবেলাতেই কালিম্পংএর এক গ্রাম থেকে আরিতার মনাস্ট্রিতে চলে আসে লামা হওয়ার জন্য। সে একজন দক্ষ শিল্পী, এই মঠের সব চক্রের ছবিই ওর তত্ত্বাবধানে আঁকা হয়। তা ছাড়াও, পাহাড়ের গাছপালা, মাটি, পাথর সে নিজের হাতের রেখাগুলোর মতো চেনে। আর বৌদ্ধ-ধর্ম-তত্ত্বের বিষয়েও ওর বুৎপত্তি ঈর্ষণীয়। রং তৈরি করা শেখাতে শেখাতে গল্পের ছলে তান্ত্রিক বৌদ্ধ-ধর্মের বিভিন্ন সূত্র ব্যাখ্যা করে দেয় ওংলিং। মেঘনার একদিকে সুবিধেই হয়েছে, বই পড়ে যেসব তত্ত্বকথা বোঝা যায় না, ওংলিং সেগুলোই সহজ সরল ভাষায় বুঝিয়ে দেয়। একসঙ্গে কাজ করতে করতে ওংলিং আর মেঘনার মধ্যে একটা বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে গেছে মাত্র ক-দিনেই। শুধু কাজের কথাই নয়, ও মাঝে মাঝে ওর কালিম্পংএর গ্রামের বাড়ির গল্প বলে, বলে ওদের সমাজের সেই প্রথার কথা, যেখানে প্রতিটি বাড়ির থেকেই একজন করে সন্তানকে খুব ছোটোবেলাতেই মঠে পাঠিয়ে দেওয়া হয় লামা হওয়ার জন্য। লামা হলে কত সম্মান, সাধারণ মানুষ লামাদের কত উঁচু চোখে দেখে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এর সঙ্গে অবশ্য এটাও জানাতে ভোলে না, লামা হওয়ার ফলে সারাজীবনের জন্য ও গৃহী জীবন থেকে বঞ্চিত। তা ছাড়াও যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমাজ-ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ফলে এখনকার দিনে লামারা আর তেমন সম্মান কোথায় পায়! শুধু মঠের প্রধান লামাই যা কিছু সুযোগ-সুবিধে পান। এই যে আরিতার মনাস্ট্রি, যেখানে ওংলিংকে ছাড়া কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজই হয় না, সেখানেও আরিতারের ক-জন মানুষ আর ওকে ততটা গুরুত্ব দেয়! তবে, ওংলিং এখন আর এগুলো নিয়ে মাথা ঘামায় না। পড়াশুনো আর ওর জন্য নির্দিষ্ট কাজকর্ম নিয়ে বেশ তো দিন চলে যাচ্ছে। ও শুধু শিখতে চায়।

এটাই যা আক্ষেপ, শিক্ষার যথার্থ প্রয়োগ করে ওঠা বোধহয় আর কোনোদিনই হবে না।

মেঘনার মনে হয়, যা বাবা, এই লামাদের মনের মধ্যেও এত ক্ষোভ, এত যন্ত্রণা! ওর নিজের জীবনের সঙ্গে যেন একদম মিলে যাচ্ছে ওংলিংএর ভাবনা-চিন্তা। যাই হোক ওংলিং বড়ো যত্ন নিয়ে কাজ শেখায়। এই তো সেদিন, বজ্রযানের শূন্যের তত্ত্ব কী সরল করে বুঝিয়ে দিল! মেঘনা তো ভেবেছিল, ওর মাথায় কোনোদিন এসব ঢুকবেই না। ওর কাছে কাজ শিখতে শিখতে মেঘনার কেমন যেন একটা ঘোর লেগে যাচ্ছে, নিজেকে মনে হচ্ছে এক নেশাগ্রস্ত মানুষ। যেন, সে মেঘনা সান্যাল নয়, বহুযুগ আগের এক বৌদ্ধ ভিক্ষুণী, একজন থেরি, গভীর তন্ত্র-সাধনায় রত। যেন তন্ত্রের গূঢ় তত্ত্বগুলি লিখে রাখছে তালপাতার পুথিতে। কেবল মেঘনা নিজেই নিজেকে বারবার করে সাবধান করে, কোনও অসতর্ক মুহূর্তেও পটগুলোর কথা কিছুতেই ওংলিংকে বলা যাবে না। ওরা লামাকে কথা দিয়েছে। ওংলিং পটগুলোর কথা কিছুই জানে না, ও শুধু এটুকু জানে, মেঘনা কলকাতার একজন শিল্পী, ভেষজ রং তৈরি করা শিখতে এই মঠে এসেছে।

৮

একটা সুড়ঙ্গ। কালো ও গভীর সেই সুড়ঙ্গের ভেতর কোথাও একফোঁটা বাতাস নেই। শুধু কিলবিল করছে রাশি রাশি কীট ও কীটাণু। মেঘনা তলিয়ে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে ওর সমস্ত শরীর। উঠে আসার প্রাণান্তকর চেষ্টায় ও প্রাণপণে দু-হাত ওপরের দিকে ছুড়ে দেয়, কিন্তু কী পিচ্ছিল এই সুড়ঙ্গ, ক্রমাগত টেনে নিচ্ছে অতল অন্ধকারে। কোথাও এতটুকু আকাশ নেই। মেঘনার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আর ধীরে ধীরে ওর চামড়া ভেদ করে মাংস খুবলে খুবলে খাচ্ছে এই কীটের দল, ওর শিরা ও ধমনীর ভেতর দৌড়ে বেড়াচ্ছে, চুষে নিচ্ছে হাড় মজ্জা রক্তরস। ও শুধু পিছলে যাচ্ছে, পায়ের তলায় কোনো জমি নেই, শুধু নেমে যাচ্ছে আর নেমেই যাচ্ছে। চিৎকার করে ওঠে মেঘনা।

এই ওঠো ওঠো, মালার উপর্যুপরি ধাক্কায় ধড়মড়িয়ে উঠে বসে মেঘনা। ওহ, এটা স্বপ্ন ছিল! এখনও বুকের ভেতর কেমন ধড়ফড় করছে। ওর স্বপ্নে বারবার ওর ছবির উপাদানগুলো এসে যাচ্ছে। এই নিয়ে তিন তিন বার। মাশান নিয়ে কাজ করতে শুরু করে, সারাদিন একই বিষয় নিয়ে পড়াশোনা, ভাবনা চিন্তা করতে করতে ওর ভেতর এক অদ্ভুত প্রবণতা তৈরি হয়েছে, সব ঘটনার সঙ্গে মাশানের অস্তিত্বের একট সংযোগ খুঁজতে চাওয়া। কিন্তু এই অন্ধকার সময়ে কোন বিশ্বাসের কাছে ও সমর্পণ

করবে নিজেকে, ওকে কে উদ্ধার করবে এই অতলান্ত খাদ থেকে, কোথায় সেই আলোকময় হাত!

মালা একটা থালায় রুটি আর সবজি এনে ওর সামনে রাখে। তারপর ওর হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে একটা জলের বোতল এগিয়ে দেয়। খেয়ে নিয়ে ঠান্ডা মাথায় বলে দাও তো পটগুলো কোথায় রেখেছ?

তোমাদের দেওয়া খাবার আমি খাব না, মেঘনা থালাটা ঠেলে সরিয়ে দেয়।

ঈশ, নবাবের বেটি এসেছে, খাবে না, ন্যাকামি হচ্ছে! তোমার ঘাড় খাবে। ওসব নখরাবাজি তোমার বাপের জমিদারিতে বসে করো। আমার সামনে এসব ঢ্যামনামি করলে একদম তেল বের করে ছেড়ে দেব। দেখি কতদিন না খেয়ে থাকতে পার, আমার নামও মালা, একবার যদি খাবার নষ্ট করো, আর খেতেই দেব না, এই আমি বলে দিলাম।

শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলোকে যে অস্বীকার করা যায় না, শত রাগ হলেও যায় না, সেটা টের পায় মেঘনা। খাবারের গন্ধে এতক্ষণে খিদেটা মালুম হয়। কাল বিকেল থেকে পেটে কিছু পড়েনি, চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খেয়ে তো কোনো লাভ নেই। আর না খেলে লড়াই করার জোরই বা পাবে কোত্থেকে? লাল আটার মোটা মোটা রুটি আর ট্যালট্যালে আলুর তরকারি। দেখেই অভক্তি হয়। কিন্তু খিদে বড়ো বালাই। এক টুকরো রুটি ছিঁড়ে মুখে দেয়। একটু জল খায়। কিছুটা খাওয়ার পর শরীরটা একটু ধাতস্থ লাগে।

মালা, আমি বাথরুমে যাব।

উফ, জান কয়লা করে দেবে দেখছি, চলো দেখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু সাবধান, পালানোর চেষ্টা করো না। তাহলে কিন্তু একদম জ্যান্ত পুঁতে রেখে দেব।

পালাব মানে! তোমাদের সবকটাকে জেলের ঘানি না টানিয়ে আমি কোত্থাও যাব না। আমার নামও মেঘনা সান্যাল। বিশ্বাস না হয় তুমিও চল আমার সঙ্গে।

এই চোপ, আবার বড়ো বড়ো বাতেল্লা! এইসব বাতেল্লা শুনলে না আমার ঝাঁট জ্বলে যায়। দিয়ে যা, দিয়ে যা, যত পারিস বাতেল্লা দিয়ে যা। শর্মা এলেই সব লেকচারবাজি বেরিয়ে যাবে, মালা ওর হাত ধরে হেঁচকা টানে একটা দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়,

এই দেখ পাথর দিয়ে সিঁড়ি বানানো আছে, নিচে নেমে যা, আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি। নিচে ওই বড়ো গাছটার পেছনে বসে পড়। আর এই ড্রামটায় জল আছে। ঘরের পেছনদিকের দেওয়ালে একটা দরজা ছিল মেঘনা এতক্ষণ খেয়াল করেনি।

ড্রামের চেহারা দেখে মেঘনার প্রবৃত্তি হয় না ওটা ধরতে, জল তো দূরের কথা। ইস, একটু হ্যান্ড স্যানিটাইজার থাকলেও হত, মনে ভাবনাটা আসতেই এত দুঃখের মধ্যেও হেসে ফেলে। কুঁজোর চিৎ হয়ে শোয়ার শখ! কিডন্যাপড হয়ে পড়ে আছে কোথায় না কোথায়, তার মধ্যেও হ্যান্ড স্যানটাইজার! শত দুর্বিপাকেও মানুষ তার অভ্যেস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে না, এটা আজ হাড়েহাড়ে উপলব্ধি করছে মেঘনা।

ওখানে জোঁক থাকবে না তো? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে মেঘনা।

হাসালে মাইরি। এই মার্চ মাসে জোঁক! ন্যাকা! তোমাদের না ভরা বর্ষায় ন্যাংটো করে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ছেড়ে দিতে হয়। যাও, জলদি জলদি করো। আমার কি আর অন্য কোনও কাজ নেই, সারাক্ষণ মহারানির খিদমত করে যাব!

মালা যতই তাগাদা দিক না কেন, মেঘনা বাইরে এসে হাত-পায়ের জট ছাড়ায়। উফ, মনে হচ্ছে কত যুগ পরে খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিচ্ছে। গাছটার পেছনে দুহাত মতো জমি, তারপরই অতল খাদ। পাশের একটা গাছে কী একটা পাখি ডেকে উঠল। আরে বাহ, এ তো ধনেশ পাখি! এতদিন শুধু ছবিতেই দেখেছিল, চাক্ষুষ করল এই প্রথম। জায়গাটা ঠিক কোথায় ঠাহর করার চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না।

মালা যতই তাগাদা দিক না কেন, মেঘনা বাইরে এসে হাত-পায়ের জট ছাড়ায়। উফ, মনে হচ্ছে কত যুগ পরে খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিচ্ছে। গাছটার পেছনে দুহাত মতো জমি, তারপরই অতল খাদ। পাশের একটা গাছে কী একটা পাখি ডেকে উঠল। আরে বাহ, এ তো ধনেশ পাখি! এতদিন শুধু ছবিতেই দেখেছিল, চাক্ষুষ করল এই প্রথম। জায়গাটা ঠিক কোথায় ঠাহর করার চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। এখান থেকে কি পালানো যাবে! পালিয়ে যাবেই বা কোনদিকে, একে তো ভিনরাজ্য, তায় আবার পাহাড়ি এলাকা, পথঘাট একেবারেই চেনা নয়।

কী হল, এত টাইম লাগাচ্ছ? মালা হাঁক পাড়ে।

মেঘনা বুঝতে পারে পুরোপুরি নজরবন্দী হয়ে আছে। সামনে ভয়ঙ্কর শত্রু, পেছনে খাদ।

ঘরে এসে বোতলের জলেই হাত ধুয়ে চোখেমুখে একটু জল দিতে যেতেই মালা বলে, লাটসায়েবের বেটি এসেছে, খাওয়ার জল তুমি এভাবে নষ্ট করছ, জানো আমাদের পাহাড়ে জলের কী কষ্ট, একটু খাওয়ার জলের জন্য আমাদের কত দূর দূর যেতে হয়!

মেঘনা ঝাঁজালো স্বরে বলে, কে তোমাদের মাথার দিব্যি দিয়েছিল আমাকে আটকে রাখতে? ওই নোংরা জল আমি ব্যবহার করতে পারব না। যেমন ধরে এনেছ, এখন ভোগো।

মালা একহাতে মেঘনার চুলের মুঠি ধরে ঠাস ঠাস করে চড় লাগায়। এত্ত দেমাগ তোর, এত্ত দেমাগ! এইবার অল্পের ওপর দিয়ে গেল, আর বেশি মেজাজ দেখালে, মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব। আর শোন, পুরো খাবারটা খেয়ে নিবি। আমি গরিব ঘরের মেয়ে, তোর মতো অত লম্বা চওড়া বাতেল্লা আমি দিতে পারব না, শুধু এইটুকু বুঝি খাবার নষ্ট করার চেয়ে বড়ো পাপ আর কিছুই নেই।

আমাকে পাপ-পুণ্য শেখাচ্ছ, আর এদিকে নিজেরা এক একটা চোর, খুনি, বদমাশ! মেঘনা নিজেকে আর সামলাতে পারে না।

আবার বড়ো বড়ো লেকচার! খুনি বদমাশ হয়েছি, বেশ করেছি, তাতে কার বাপের কী!

এই কী এত ঘুসুরফুসুর হচ্ছে? খেতে কত ঘন্টা লাগে মেমসাহেবের?

আসছি আসছি। এই ম্যাডাম, পালানোর চেষ্টা কোরো না, তাহলে কিন্তু বিপদ, আমি বারবার বলছি। মালা তড়িঘড়ি এঁটো থালাবাসন নিয়ে বেরিয়ে যায়। যাওয়ার আগে অবশ্য মেঘনার হাতদুটো বেঁধে দিতে ভোলে না।

মালা চলে যেতে মেঘনা টের পায় ঘোরটা এখনও কাটেনি। বরং ঘুমের ওষুধের পর খাবার খেলে যেমন গাঢ় ঘুম পায়, তেমন অবসাদে শরীর ভেঙে আসছে। এরা কত কড়া ডোজের ওষুধ দিয়েছিল কে জানে! কিন্তু শুতে গিয়ে টের পায় সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা। সারারাত পিছমোড়া করে বেঁধে রাখার ফল। তাছাড়াও যখন অজ্ঞান হয়ে ছিল তখন একরকম, কিন্তু, এখন এইভাবে হাতবাঁধা অবস্থায় শোবেই বা কী করে! আচ্ছা, মা বাবা যদি এইসব ঘটনা বিন্দুমাত্রও টের পান, চিন্তায় পাগল হয়ে যাবেন। বাবা ছুটে আসবেন সিকিমে। ও যখন কলকাতা থেকে রওনা দিয়েছিল মঠের উদ্দেশ্যে তখন দুচোখ ভরা স্বপ্ন, ওর ছবি কম্পিটিশনে ফার্স্ট হবে, প্যারিসের দরজা খুলে যাবে ওর জন্য। মানুষ ভাবে একরকম আর জীবন তাকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যায়! মাথাটা ছিঁড়ে পড়ছে। একটা প্যারাসিটামল পেলে ভালো হত। মেঘনা কোনোমতে পাশ ফিরে এককাত হয়ে মেঝেয় পাতা কম্বলের ওপর শুয়ে পড়তেই কখন যে ঘুমে চোখ জড়িয়ে গেছে টেরও পায়নি।

মালার ডাকে ঘুম ভাঙে। মালা চা নিয়ে এসেছে। এ তো মেঘ না চাইতেই জল। মেঘনা অবাক হয়ে যায়। হঠাৎ এত আপ্যায়ন! উঠে বসে মেঘনা টের পায় বেশ

ঠান্ডা পড়ে গেছে। চায়ের গ্লাসটা দু অঞ্জলিতে ধরে তার থেকে উত্তাপ শুষে নিতে চায়। মনে হচ্ছে যেন কত যুগ পরে চা খাচ্ছে।

শোনো, মালা কম্বলের একপাশে গ্যাঁট হয়ে বসে, অনেক মেজাজ দেখিয়েছ, গরম গরম কথা বলেছ, তাও তোমাকে কিছুই করিনি, এবার কিন্তু তোমার কপালে সত্যি সত্যিই দুঃখ আছে। পটগুলোর কথা না বললে বস তোমাকে নিয়ে যে কী করবে তুমি ভাবতেও পারছ না। বস বলেছে, তুমি যদি সব সত্যি কথা বলে দাও, আজকেই তোমাকে ছেড়ে দেবে। আর তা নইলে... এই তো গেল বছর এক টি গার্ডেনের ম্যানেজারের বউকে ধরে এনেছিল, তারপর মুক্তিপণের টাকা না দেওয়ায় তাকে সাতদিন ধরে একটা ঘরে আটকে রেখে সবাই মিলে রেপ করে, পাথর দিয়ে মাথাটা থেঁতলে জঙ্গলে ফেলে রেখে দেয়, যাতে আর কেউ দেখলেও চিনতে না পারে।

মেঘনা আঁতকে ওঠে মনে মনে। কিন্তু, ও যে ভয় পেয়েছে, এটা কিছুতেই বুঝতে দেওয়া যাবে না। তাহলে এরা আরও পেয়ে বসবে। ও গোঁজ হয়ে বসে থাকে।

ভাবো ভাবো, কী করবে ভেবে ঠিক করো। বস এই এল বলে।

ভাবা ছাড়া এই মুহূর্তে আর কীই বা করার আছে মেঘনার! শুধু অসহায়ের মতো ভেবে যাওয়া। যেন খাঁচায় আটকা পড়া এক বনের পাখি, যে ভেবেছিল উড়ে যাবে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে ছবির শহর, তার স্বপ্নের শহর প্যারিসে।

**

সেদিন মঠে অনেকক্ষণ কাজ করেছে। রং তৈরির কৌশল কিছুটা হলেও আয়ত্ত হয়েছে। কিন্তু একটাই চিন্তা, কলকাতায় বসে এইসব উপকরণ ও কোথায়

পাবে। ওংলিং অবশ্য বলেছে, ছবির জন্য প্রয়োজনীয় রং তৈরির উপাদান ও মেঘনাকে যাওয়ার সময় দিয়ে দেবে। নিদেনপক্ষে বারোটা ছবি করতেই হবে, তার থেকে গ্যালারির ওরা কটা সিলেক্ট করবে, সেটা ওদের ব্যাপার। ওকে জান লড়িয়ে দিতে হবে। এরকম সুযোগ বারবার আসে না। হোমস্টেতে ফিরে চা আর পকোড়া খাওয়ার পর ল্যাপটপটা খুলে বসেছিল। আর ভালো লাগছে না। একে তো সারাদিন এই কঠিন পরিশ্রম, তার ওপর হোমস্টের খাওয়াদাওয়াও খুব একঘেয়ে। প্রতিবেলায় একই সবজি, জলখাবার, টিফিন সবই এক। আজ খিদেও পেয়েছে জোরদার। সন্ধে বেলায় ও প্রায়ই ভিউপয়েন্টের ওখানে গিয়ে কাঠের বেঞ্চিটাতে বসে থাকে। জ্যাকেটটা পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে বেশ ঠান্ডা। আজ পূর্ণিমার রাত, কাকজ্যোৎস্নায় সমস্ত পাহাড় যেন সুররিয়্যাল ছবির মতো দেখাচ্ছে। ভিউ পয়েন্টে যাওয়ার চড়াইটা আজ মনে হচ্ছে কী লম্বা! অন্যদিন গায়েই লাগে না, কিন্তু আজ পরিশ্রমটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের হয়ে গেছে, পা যেন আর চলছে না। যাক, ওখানে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলে সব ক্লান্তি ধুয়ে মুছে যাবে, ও মনে মনে ভাবে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় ভিউ পয়েন্টটার দিকে। ওখানে একটা ছোট্ট দোকান আছে, মোমো থুকপা এসব বিক্রি করে। মুখটাও বদলানো যাবে। আজ আর ওই চিকেনের ঝোলভাত খেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু ওর কপালটাই খারাপ, এত দেরি করে এল যে দোকানটা বন্ধ হয়ে গেছে। সন্ধের পর ট্যুরিস্টরা এদিকে বিশেষ ঘেঁষে না, আর পাহাড়ের লোকজনের একটু তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাস। যাক গে, কিছুক্ষণ তো শান্তিতে বসে থাকা যাবে। আজ লামপোখরি লেক যেন তার সবটা সৌন্দর্য্য নিয়ে ধরা দিয়েছে। ও প্রথমে ভেবেছিল, কোনও লামার নাম থেকে বোধহয় আরিতার লেকের নাম লামপোখরি হয়েছে। পরে রবীন সেই ভুল ভাঙিয়ে দেয়। লম্বা আকারের বলেই এই লেকটার নাম

লামপোখরি। 'লাম' শব্দটা নেপালি ভাষার। সিকিমের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ নেপালি।

আজ লেকের জলে পাইনগাছের ছায়াগুলোর নড়াচড়াও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ও অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। ঝিঁঝি ডাকছে পাইনের জঙ্গলে, আর কোথাও কোনও শব্দ নেই, চারিদিক শুনশান। প্রকৃতি একেক সময় মানুষের ওপর ভর করে, ভূতগ্রস্তের মতো করে দেয়। মেঘনাকেও আজ যেন জ্যোৎস্না ভর করেছে। চাঁদের আলোর মতোই স্থির, অবিচলভাবে সেও বসে থাকে, যেন, ভিজে যাওয়া এক গাছ, সংপৃক্ত, তৃপ্ত। হঠাৎই কিছু কথাবার্তা কানে আসায় চমকে ওঠে, তন্ময়তা কেটে যায় মেঘনার। এই সময় অন্যদিন এখানে তো বিশেষ লোকজন দেখেনি। ভিউ পয়েন্টের থেকে আরিতার লেকে যাওয়ার একটা রাস্তা নেমে গেছে। সুঁড়িপথ। পাইনবনের ভেতর দিয়ে। ওদিক থেকেই ভেসে আসছে কথাগুলো। মেঘনা ঠাহর করার চেষ্টা করল, তিনটে গলার স্বর শোনা যাচ্ছে, বেশিটাই হিন্দিতে কথা হচ্ছে, আর মধ্যে মধ্যে টুকরো টাকরা নেপালি শব্দ। সব কথা শুনতে শুনতে মেঘনার মনে হয়, হৃদপিণ্ডটা ধক করে গলার কাছে উঠে এসেছে। সমস্ত শরীর বেয়ে একটা শিরশিরানি নেমে যায়। একেই কি ভয় বলে!

লামাটা মাইরি হেব্বি ঘাগু মাল, এমনিতেই ওর ঘরে কাউকে ঢুকতে দেয় না, তার ওপর আবার আমাদের দেখে যদি চেল্লামিল্লি জুড়ে দেয়!

আবে চোপ, ঢুকতে দেওয়া না দেওয়ার ও কে বে? দাজু বলেছে ওই ঘরেই আছে সব মাল। দাজুর কাছে খবর আছে, লামার খাটের নিচেই একটা বাক্সের মধ্যে আছে মালগুলো।

শোন, মঠে কিন্তু অনেকগুলো পোষা কুকুর আছে, খুব খতরনাক। ওদের পাল্লায় পড়লে আর জান নিয়ে ফিরে আসতে হবে না। মাংসের মধ্যে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ঘরে ঢুকে প্রথমেই

লামার মুখটা বেঁধে ফেলবি। তারপর কাজ শেষ হলেই ফিনিশ।

ধুর, অত সময় থাকবে হাতে? যন্ত্রগুলো আছে কী করতে? ঘরে ঢুকেই বুড়োর কপালে যন্তর ঠেসে ধরবি, যাতে কোনও ট্যান্ডাই ম্যান্ডাই করতে না পারে। কিন্তু খবরদার, গুলি চালাবি না। তাহলেই মঠের লোকেরা সব উঠে পড়বে।

তারপর ওই পট না ভাট কী বলে ওগুলো নিয়ে একেবারে সোজা বসের ডেরায়।

ঘটনার আকস্মিকতায় মেঘনা প্রথমে হকচকিয়ে যায়, তারপর আস্তে আস্তে কিছুটা ধাতস্থ হয়েই কর্তব্য স্থির করে ফেলে। কাউকে জানানো যাবে না। এমনকি সুদীপ্তকেও না। পাঁচকান হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে আসে। এখন কী করণীয়, তা ও ঠিক করে নিয়েছে। মোটা জ্যাকেটটা গায়ে চড়িয়ে হুডটা টেনে দেয়। তাড়াতাড়ি স্নিকার্সের ফিতে বেঁধে, মোবাইল আর ওয়ালেটটা সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। মার্চ মাস হলেও বাইরে ভালোই ঠান্ডা। গ্লাভস পরে এলে ভালো হত, কিন্তু এখন আর অতসব ভাবার সময় নেই। ও হাতদুটো পকেটে ঢুকিয়ে নেয়। দ্রুত পা চালায় মনাস্ট্রির দিকে। অনেকটা পথ। পাহড়ি রাস্তা খাঁ খাঁ করছে। এই ছোট্ট গ্রামে সাতটার পরেই বাইরে লোক চলাচল কমে যায়। এখন তো প্রায় আটটা বাজে। ও প্রায় দৌড়োতে থাকে। শয়তানগুলো যদি ইতিমধ্যেই পৌঁছে যায়! ওরা নিশ্চয় পায়ে হেঁটে যাবে না। নাহ, আর ভাবতে পারছে না। ওর যতটা চেষ্টা করার ও করবে।

আচার্য তখন শোয়ার আয়োজন করছেন, অন্যান্য শ্রমণেরা বোধহয় যে যার ঘরে। মঠপ্রাঙ্গণ একদম ফাঁকা। ছুটতে ছুটতে আচার্যর ঘরে ঢোকে। ওকে এই সময় দেখে আচার্য অবাক দৃষ্টিতে তাকান, তাঁর চোখেমুখে জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে।

মেঘনা ইশারায় ওঁকে চুপ করতে বলে, তারপর হাঁফাতে হাঁফাতেই বলে,

বিপদ!

কার বিপদ, কীসের বিপদ? লামা প্রশ্ন করেন।

আপনার, এই মঠের, আর আমি আপনাকে জানিয়েছি জানলে আমারও, এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে একবার ঢোঁক গেলে মেঘনা।

পটগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে। যে কোনোভাবেই হোক এই পটের কথা বাইরে বেরিয়ে গেছে।এখন চোরাচালানকারীরা আসছে ওগুলো ছিনিয়ে নিতে। আমি নিজে কানে শুনেছি ওদের কথাবার্তা।

লামা প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে যান। এত গোপন খবর কী করে বাইরে চলে গেল, সেটা বুঝে উঠতে পারেন না। কিন্তু আশু কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন পরমুহূর্তেই, তুমি কী করে এত কিছু জানলে? মেঘনার কথাকে কতটা গুরুত্ব দেবেন, তা নিয়েও তাঁর মধ্যে দ্বিধা দেখা দেয়। মেঘনা আবার নিজেই পটগুলো হাতানোর জন্য কোনও চাল চালছে না তো!

শোনো, আমি এই মুহূর্তে আর বেশি কিছু ভাবতে পারছি না। এত অল্প সময়ে পটগুলো এখান থেকে সরানো অসম্ভব, তা ছাড়া আমার বয়েস হয়েছে, অন্য কাউকে বিশ্বাস করে এগুলো ছাড়াও যাবে না।

তাহলে উপায়? পটগুলোর কী হবে! ওরা যে-কোনো সময় চলে আসতে পারে। দুশ্চিন্তায় আতঙ্কে মেঘনা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে।

এছাড়া সেই মুহূর্তে ওর কিচ্ছু করার ছিল না। একবার মনে হল সুদীপ্তকে ফোন করে, তারপরই ভাবল ওকে ফোন করলে প্রচুর প্রশ্নের সামনে পড়তে হবে। তা ছাড়া, এই এত রাতে গুম্ফায় আসার কারণও বলতে হবে। তার চেয়ে যেমন একলা এসেছিল তেমন চুপচাপ ফিরে গিয়ে ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়বে। আজ মেঘনা বুঝতে পারছে, খুব আনাড়ির মতো কাজ হয়ে গেছে। সে-রাতে মেঘনা যদি মেইন-রোড ধরে না গিয়ে পাইনবনের ভেতর দিয়ে চোরাবাটোর রাস্তায় হোম-স্টেতে ফিরে আসত, তাহলে আর ওর টিকির ডগাও কেউ ছুঁতে পারত না।

ফেরার পথে মালুম হয় ঠান্ডাটা আরও কড়া হয়েছে। ও হাতদুটো ঘষল, তাও যেন ঠান্ডা যায় না। এখন পুরোটাই চড়াই। এতক্ষণের উত্তেজনায় ক্লান্তি টের পায়নি। কিন্তু এবার হাঁটতে গিয়ে টের পেল, পা দুটো যেন খুলে আসছে। কিন্তু থামলে চলবে না। যতটা পারা যায় তাড়াতাড়ি পা চালাল। দূরে একটা বাড়ি থেকে টিভির আওয়াজ ভেসে আসছে, রাস্তাঘাটে কোনও লোকজন নেই। একটা কুকুর ডেকে উঠতে মেঘনা খুব ভয় পেল। এই পাহাড়ি কুকুরগুলো বেশিরভাগ বাড়িতে হাঁস মুরগি পাহারা দেওয়ার জন্য থাকে, খুব হিংস্র। এদের একটার সামনে পড়লে আর রক্ষে নেই, একেবারে কামড়ে কুটিকুটি করে ফেলবে। ও আরও একটু গতি বাড়াল। সামনে কোনও ল্যাম্পপোস্টও নেই। চারদিকের ঘন গাছপালা চাঁদের আলো আড়াল করে দিচ্ছে। তার ওপর আছে কুয়াশা। এত জমাট কুয়াশা যে, দু-হাত দূরে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলেও দেখা যাবে না। প্রায় অন্ধকার রাস্তা। ও মোবাইল বের করে টর্চটা জ্বেলে নিল। এমন সময়ে একটা গাড়ির আওয়াজ। এক ঝলক মোবাইলের দিকে তাকিয়ে দেখে এগারোটা বেজে গেছে। এত রাতে, এই পাহাড়ি গ্রামের রাস্তায় গাড়ি তো দূরের কথা, কোনও মানুষও বিপদে না পড়লে সহজে বাড়ি থেকে বের হয় না। এই ক-দিনে মেঘনা এখানকার জীবনযাত্রা খেয়াল করে দেখেছে। তবে কি অ্যাম্বুলেন্স, উঁহু, তাহলে তো মাথায় বাতি থাকত, তবে! ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন ওকে নিমেষে সতর্ক করে দিল। ঠিক সেই সময়েই একটা মারুতি ভ্যান সাঁ করে ওর পাশে এসে দাঁড়াল আর দুটো বলিষ্ঠ হাত ওকে ভেতরে টান দিতেই মেঘনা একটা আপার কাট চালাল লোকটার থুতনি লক্ষ্য করে। ও প্রায় পাঁচ বছর ক্যারাটে শিখেছে, ওকে কাবু করা এত সহজ না। কিন্তু অচিরেই টের পেল লোকটার গায়ের জোর অনেক বেশি, তার ওপর সঙ্গে আরও লোকজন আছে। কিন্তু একলা একটা মেয়েকে কিডন্যাপ করা যতটা সহজ

ভেবেছিল ওরা, তত সুবিধে করতে পারল না। কিছুটা হলেও লড়াই দিয়ে তবে মেঘনা ধরা দিল। তাও শেষ চেষ্টা করতে পারত, কিন্তু ওরা একটা রুমাল মুখে চেপে ধরল, এই অব্দি স্পষ্ট মনে আছে। তারপর...

বাইরে একটা গাড়ির শব্দে ওর হুঁশ ফেরে। একটানে কেউ যেন ঘেঁটি ধরে বাস্তবের পৃথিবীতে নামিয়ে আনে।

ভালো করে তাকিয়ে দেখে, সন্ধে হয়ে গেছে। কী নির্জন জায়গা রে বাবা! এখানে শত চেঁচালেও কোনও লোক আসবে না। শুধু রোহিত আর সোনামের টুকটাক কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। মালার কথা শুনে অবধি রীতিমতো আতঙ্ক হচ্ছে। মালা সত্যি বলছে, নাকি ওকে ভয় দেখানোর এটা একটা নতুন রাস্তা? কাম অন মেঘনা, বি কুল, নিজেই নিজেকে বলে। এখন বুদ্ধি স্থির রাখাটাই সবচেয়ে বেশি জরুরি। এতক্ষণে নিশ্চয় সুদীপ্ত পুলিশকে ইনফর্ম করে দিয়েছে। কিন্তু পুলিশ কি এই জায়গার সন্ধান পাবে, সন্ধান পেলেও আদৌ কিছু করবে! মেঘনা আর ভাবতে পারছে না। কিন্তু এই ঘোর সন্ধে বেলায় এত শুনশান জায়গায় আবার গাড়ি নিয়ে কে এল!

৯

দু-দুটো দিন কেটে গেল, ফিঙ্গারপ্রিন্ট আর পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট পেতে পেতে। প্রপার কোনও ক্লু না পেলে কিছুই করার থাকে না। এ তো আর অ্যাকশন মুভি নয়, গেলাম, ভিলেনের সঙ্গে জবরদস্ত মারপিট করে হিরোইনকে উদ্ধার করে নিয়ে চলে এলাম। খবরিগুলোও হয়েছে অপদার্থ, একটা ইনফর্মেশনও যদি জোগাড় করতে পারে, যত্তসব। এভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকা একেবারেই ধাতে নেই তমালের। ট্রেনিংয়ের সময় একরকম শেখানো হয়, আর হাতেকলমে কাজ করতে গেলে পদে পদে বাধা। ইন্সট্যান্ট অ্যাকশন নেওয়ার কোনও উপায়ই নেই। তার ওপর এখন পার্টিবাজির জমানা, ঝট করে কাউকে থানায় তুলে এনে ইন্টারোগেট করলে থানা ঘেরাও, ধর্মঘট ইত্যাদি হাজারো ঝামেলা। অথচ এভাবে চুপচাপ বসে থাকতে ওর অসহ্য লাগছিল। গ্যাংটক থেকে রিপোর্টের মেইলগুলো আসতেই তমাল আবার নতুন উদ্যমে লেগে পড়ে। লামার মুখে বালিশ জাতীয় কিছু ভারী কিন্তু নরম জিনিস চেপে ধরে, শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। তবে এক্সপার্ট হাতের কাজ। এমনকি অ্যাকশনের সময় কোনোরকম ধস্তাধস্তিও হয়নি, তার ফলেই দেহে আঘাতের কোনও চিহ্ন নেই। কিন্তু দ্বিতীয় মেইলটা তমালকে একইসঙ্গে বিস্মিত এবং আস্বস্ত করে। ওর বা গুরুং-এর আন্দাজ সম্পূর্ণ ভুল ছিল। লামার গায়ে পাওয়া ফিঙ্গারপ্রিন্টের সঙ্গে সুদীপ্ত বা মেঘনা, কারোর হাতের

ছাপ মিলছে না। অর্থাৎ... অর্থাৎ আর কিছুই না, অন্য কেউ খুনটা করেছে। মেঘনা কোনোভাবেই এর সঙ্গে জড়িত নয়। ওরা দলে তিনজন ছিল, তিনজনেরই হাতের ছাপ লামার গায়ে এবং ঘরের বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া গেছে। এবার দুয়ে দুয়ে চার করে ফেলতে তমালের আর সময় লাগে না, এরাই মেঘনাকে কিডন্যাপ করেছে। এদের ধরতে পারলেই সবকিছুর সন্ধান পাওয়া যাবে। কিন্তু তমাল নিশ্চিত যে ওরা পটগুলো পায়নি। তাহলে মেঘনাকে কিডন্যাপ করত না। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত তমালকে আরও বেশি দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে দেয়। মেঘনা এখন এই ভয়ঙ্কর লোকগুলোর খপ্পরে। ওরা যদি মেঘনার বড়ো কোনও ক্ষতি করে, যদি প্রাণে মেরে দেয়, যদি রেপ করে! নাহ, তমাল রায় থাকতে মেঘনার কোনও ক্ষতি কেউ করতে পারবে না। একসময় যা হয়েছে, হয়েছে। কিন্তু আর নয়। দরকার হলে গ্যাংটক থেকে পুলিশ ফোর্স আনাবে। পুরো আটঘাট বেঁধে কাজে নামতে হবে।

তমাল মেঘনার ফেসবুক প্রোফাইলটা খোলে। সেই মুখ, সেই হাসি, যার জন্য তমালকে একসময় যদি কেউ বলত ওর হৃৎপিণ্ডটা খুলে এনে হাতে দিয়ে দিতে তমাল বোধহয় তাই করত। কিন্তু সত্যিই করত কি? উঁহু। এসব ওই অল্প বয়েসের আবেগের কথা। না হলে যখন বাবা দিল্লিতে পড়তে পাঠালেন তমাল কি সেরকম জোরালো আপত্তি করেছিল?

ফড়িং তুই তো উড়তে পারিস, আমার ইচ্ছেগুলো যদি তোর মতন হত!

তুমিও তো উড়তে শিখে গেছ তমাল।

কোথায় আর!

এই যে তোমার পিঠে দুখানা ডানা আমি দেখতে পাচ্ছি।

ধেৎ, খালি বাজে বকে।

তুমি তো এবার উড়ে যাবে, আর তোমার পরি কোলকাতায় বসে একলা একলা শুকিয়ে যাবে।

আমি কি একেবারেই চলে যাচ্ছি নাকি?

দিল্লির কোলাহলে তোমার লেবুফুলের গন্ধ মুছে যাবে না বলছ, হুঁহুঁ বাবা, রাজধানী বলে কথা, কত ভিড়!

আমি অন্যদের মতো না।

ওরকম সবাই বলে।

আমি সবাই না। চুপ কর তো। আমার এখন অনেক কাজ।

এই দেখ, না যেতেই বলছ তোমার এত কাজ, আর গেলে...

আমি দুতিন মাস বাদে বাদে আসব।

আর সেই দুতিন মাস ও কী করবে?

আরে বাবা, পড়াশুনো শেষ হয়ে গেলে তো চলেই আসব।

শেষ কি? এটাই শুরু নয় কি?

ঘাসফড়িংএর কথাই সত্যি। আর ফিরে তাকানোর সময় সুযোগ কিছুই হয়নি। যাওয়ার আগে মেঘনার সঙ্গে শেষ দেখা কিশোরদের বাড়িতে। আই এস সির পর বন্ধুরা কে কোথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে, তাই সেদিন ওদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে একটা গেটটুগেদারের আয়োজন করেছিল কিশোর। তুমুল হই-হুল্লোড় চলছে, কিশোরের মা, কাকিমার রান্নার এমনিতেই সবাই ভক্ত। তার ওপর কাকিমা সেদিন উদার হাতে পরের পর ভালো ভালো খাবার পরিবেশন করেই যাচ্ছেন। যদিও তমাল নিজেকে ঠিক মেলাতে পারছে না এই হইচই আনন্দের মধ্যে। ক-দিন থেকেই বাবার সঙ্গে মতবিরোধ চলছে দিল্লিতে পড়তে যাওয়া নিয়ে। সেই নিয়ে এমনিতেই মাথা গরম হয়ে আছে। তার ওপর সকাল থেকে মনটা কু গাইছে। কেন জানি না বারবার মনে হচ্ছে আজই মেঘনার সঙ্গে শেষ দেখা। অথচ বলি বলি করে আজ অব্দি ও মেঘনাকে দিল্লিতে চলে যাওয়ার কথা বলেই উঠতে পারেনি। আজ বলতেই হবে। তমালের বেশ মনে আছে, ও খুব নার্ভাস বোধ করছিল। কীভাবে সবটা বলবে, আর মেঘনাই বা কীভাবে নেবে ব্যাপারটা ভাবতেই

একটা অস্বস্তি ওকে ঘিরে ধরছিল। কিন্তু বলতে তো হবেই। ওরা পাশাপাশিই বসে ছিল। তমাল ফিশফিশ করে মেঘনাকে বলে, আমি ছাদে যাচ্ছি, তুই একটু পরে আয়। যদিও ইতিমধ্যে বন্ধুরা সবাই জেনে গেছে ওদের সম্পর্কের কথা, তবু কাকিমা আছেন, তাই এই সতর্কতা। বাড়িতে জানাজানি হলে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব।

ছাদের কোণে যেখানে একটা ছাতিম গাছ তার ডালপালা বিছিয়ে আলোআঁধারি তৈরি করে রেখেছে, তমাল সেইখানে গিয়ে দাঁড়ায়। কেমন অস্থির অস্থির লাগছে। এক-একটা মিনিটকে মনে হচ্ছে যেন এক-এক ঘন্টা। মেঘনা এখনও আসছে না কেন! ওকে তো বলতেই হবে। যত কষ্টই হোক না কেন, আজ এই অপ্রিয় কথাগুলো বলতে হবে।

তমাল ভেবেছিল মেঘনা হয়তো কেঁদেকেটে চিৎকার চেঁচামেচি করে একশা করবে। মেঘনা সব শোনে, কিন্তু সেরকম কোনও প্রতিক্রিয়া দেখায় না। তমাল শুধু দেখে, মেঘনা সবকিছু শোনার পর একদম চুপ মেরে গেছে। ওর মুখে কোনোরকম অভিব্যক্তিই নেই, শুধু ফরসা মুখটা যেন আরও সাদা হয়ে গেছে।

তমাল আরও ঘাবড়ে যায়, আমার হাতে কিছুই নেই রে, ক-দিন ধরেই এই নিয়ে বাড়িতে তুমুল অশান্তি চলছে। বাবা কিছুই শুনতে চাইছেন না। তুই ভাবিস না, আমি তো এক-দুমাস বাদে বাদে বাড়ি আসবই। তখন ঠিক দেখা হবে, আই প্রমিস।

ছাড় না, এ নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ আছে! মেঘনা মাথা নিচু করে। আচ্ছা, সেদিন মাথা নিচু করে মেঘনা কী আড়াল করতে চাইছিল!

আচমকা মোবাইল বেজে ওঠে। এত রাতে ফোন! তমালের কপালের ভাঁজ গাঢ় হয়।

হ্যালো, স্যার শুনতে পাচ্ছেন?

অপরিচিত গলা, তমাল প্রচণ্ড বিরক্ত হয়। একেই এই কেসটা নিয়ে ঘেঁটে আছে, তার ওপর এখন নতুন কোনও কেস এলে হয়ে গেছে, আর ওর মোবাইল

নাম্বার যে সে পাচ্ছে কী করে! গ্যাংটকে ফিরে অফিসের সবকটাকে আচ্ছাসে কড়কাতে হবে।

হ্যাঁ, কে বলছেন?

স্যার আমার নাম লোকবাহাদুর ছেত্রী। আমি মেঘনাম্যাডামের ভাড়ার গাড়ির ড্রাইভার। আপনার সঙ্গে এক্ষুনি একবার দেখা করা যাবে?

১০

দরজার বাইরে ভারী বুটের আওয়াজ। দুটো লোককে ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢোকায় রোহিত আর সোনাম। মেঘনা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণের জন্য মাথাটা সম্পূর্ণ ফাঁকা বলে মনে হয়। কেউ যেন একটা ডাস্টার দিয়ে ওর মুখ থেকে সমস্তরকম অভিব্যক্তি মুছে দিয়েছে। ওরা সুদীপ্ত আর লোকবাহাদুরকে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে এসেছে। ওদের পেছনে লম্বা চওড়া একটা লোক, হাবভাব দেখে মনে হয়, এই এদের দলের মাথা।

একি, ম্যাডামের হাত-পা বেঁধে রেখেছিস কেন, এই শালা রোহিত, খোল খোল, খুলে দে, লোকটা বলল।

দিচ্ছি স্যার এক্ষুনি দিচ্ছি, রোহিত সঙ্গে সঙ্গে ওর বাঁধন খুলে দেয়।

নিন ম্যাডাম, এবার চটপট বলে দিন তো ছবিগুলো কোথায় আছে? কোনও চালাকির চেষ্টা করবেন না। তাহলে সবকটাকে মেরে জঙ্গলের কুত্তা দিয়ে খাওয়াব, আমার নামও শর্মা। আর যদি ভালোয় ভালোয় বলে দেন, তাহলে আমার জিপ বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে, এক হাতে মাল বুঝে নেব, অন্য হাতে আপনাদের ছেড়ে দেব।

এই তাহলে শর্মা। মেঘনার হুঁশ ফেরে। কী সর্বনাশ! এরা তো সুদীপ্তদেরও ধরে এনেছে। তাহলে পুলিশে খবর দেওয়ার কী হবে! কিন্তু না, মেঘনা চোয়াল শক্ত করে, এদের কিছুতেই ওর মনোভাব বুঝতে দেওয়া যাবে না। তাহলেই ওরা আরও পেয়ে বসবে।

আচ্ছা, আপনারা বারবার আমার কাছে পটগুলোর সন্ধান জানতে চাইছেন কেন, আমি তো নিজেই জানি না ওগুলো কোথায় আছে। এখানে এসেই শুনলাম, সব হারিয়ে গেছে, মেঘনা বলে।

দেখুন ম্যাডাম, এমনিতে আমি ফিমেলদের গায়ে হাত তোলা একদম পছন্দ করি না। মেয়েছেলের জন্য আমার অন্য ট্রিটমেন্ট আছে। উপরসে ইয়ে দোনো বদমাশ আবার পুলিশকে খবর করে দিয়েছে। লেকিন ওদেরকে কী করে সাইজ করতে হয়, সে-ও ভি আমার জানা আছে। আপনাকে স্রিফ আজকের রাতটা ভাবার জন্য টাইম দিলাম, কথা আমি বের করে নিব। ওসবের তারিকা আমি জানি। ওসব আপনারা শুধু ফিল্মেই দেখেছেন। এখানে ভি মুভি হবে, শুটিং ভি হবে। এখন আপনি শোচে নিন আপনি কী করবেন।

আর এই শালা লোকবাহাদুর, শালা হারামির বাচ্চা, শর্মা একটা পিস্তল বের করে লোকবাহাদুরের কপালে ঠেকায়, তুই শালা লোকাল আদমি হয়েও এইসব শহরের আদমিদের জন্য তোর ইতনা পেয়ার, তোর হালত আমি টোটাল বিলা করে দেব, তোকে আগুনে জিন্দা পোড়াব, তোর বাপও শালা তোর লাশ চিনতে পারবে না। একদম চুপচাপ বসে থাকবি, রাত্তিরে যদি কোনও উটপাটাং কাম করেছিস তো সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাতে বলে দিয়েছি।

শর্মার ভারী বুটের শব্দ মিলিয়ে যেতেই লোকবাহাদুর বলে, নসিব খারাপ হলে যা হয়, নোরবুকে ভালো লোক বলে জানতাম, একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি, আর ওই আমার সঙ্গে এরকম বেইমানি করল! তবে আমিও এর শেষ দেখে ছাড়ব।

এবার সুদীপ্ত সব কথা মেঘনাকে বলে, কীভাবে কফি খাওয়ার পর ওরা অজ্ঞান হয়ে যায় আর জ্ঞান ফিরতে দেখে একটা গাড়ির পেছনে হাতপা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। আর তারপর তো ওরা চোখও বেঁধে দিল। এমনকি মোবাইলগুলোও নিয়ে নিয়েছে। এখন কোথায় আছে তাও বুঝতে পারছে না।

সব কথা শুনে মেঘনা হতভম্ব হয়ে যায়, থম মেরে বসে পড়ে। প্রচণ্ড একটা হতাশা ওকে গ্রাস করে। মৃত্যু, অথবা তার চাইতেও খারাপ কোনও পরিস্থিতি অপেক্ষা করে আছে ওর জন্য। তা সত্ত্বেও, সুদীপ্তর সঙ্গে কথা বলার সময় ও কীভাবে বা কেন এদের পাল্লায় পড়ল সেটা খুব সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে যায়। বাইরে একটা কুকুর ডেকে উঠতে লোকবাহাদুর বলে, জায়গাটা বেশি গভীর জঙ্গলে নয়, তাহলে কুকুরের ডাক শোনা যেত না।

আমাদের পালাতেই হবে, এছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই। লোকবাহাদুর ভাইয়া যখন আছেন, ঠিক একটা না একটা উপায় হবেই। তা ছাড়াও, এখন আমরা সমান সমান, ওরাও তিনজন, আমরাও তিনজন। ওদের কাছে অস্ত্র আছে, এটাই যা চিন্তার। ওরা ঘুমিয়ে পড়লেই কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। হাত গুটিয়ে ঠুঁটোর মতো বসে থাকলে চলবে না। মেঘনা আবার সেই জেদি একগুঁয়ে মেঘনা, আজকের রাতেই না পালাতে পারলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। এরা সবকটা লুম্পেন বদমাশ।

এইজন্য বলে পরের ভালো করতে নেই। মাঝখান থেকে আমি সুদ্ধ ফেঁসে গেলাম, লোকবাহাদুর দড়ির বাঁধন খোলার জন্য মরিয়া হয়ে টানাটানি করতে করতে বলে, এখন আমার কিছু হয়ে গেলে বউটা ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে রাস্তায় বসে যাবে, হে ভগবান!

আবে চোপ, শোর মত করো। রোহিত চেঁচিয়ে ওঠে।

মেঘনাও ইশারায় ওদের চুপ করতে বলে ফিশফিশ করে বলে, বেশি কথাবার্তা বললে শয়তানগুলো ঘুমোবে না, আর আমাদেরও পালানো হবে না। এ বড়ো কঠিন ঠাঁই। এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে যা করার করতে হবে। আমি দেখেই বুঝেছি, শর্মা লোকটা ডেঞ্জারাস। আর এই মালা বলে মেয়েটাও যা বলল, তা যদি সত্যি হয়, তাহলে ওরা পারে না এমন কোনও কাজ নেই।

রোহিত আর সোনামের গলা শোনা যায়। দিব্যি ফুর্তিতে আছে। সোনাম চিৎকার করে কী একটা বলিউডি মুভির গান গাইছে।

এদিকে ঘরের মধ্যে সবাই চুপ করে যেতেই একটা গা ছমছম করা নৈঃশব্দ ওদের ঘিরে ধরে। শুধু ঝিঁঝির ডাকের ভেতর সমস্ত পৃথিবী যেন স্তব্ধ হয়ে কোনও অনভিপ্রেত ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছে। এত কথা বলা, এত মানসিক প্রস্তুতি নেওয়ার পরও মেঘনার মনে দ্বিধা দ্বন্দ্বের দোলাচল। পালাবে, না পালাবে না! পালিয়ে যাওয়ার পর এই লোকগুলোকে ধরা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এরা এই পাহাড় জঙ্গল হাতের তালুর মতো চেনে, লুকিয়ে বসে থাকলে, ধরে কার সাধ্যি! আবার পালিয়ে যাব বললেই পালানো কী অতই সহজ! এদের শকুনের নজর। হয়তো পালা করে সারারাত জেগে পাহারা দেবে। খুন করে দিয়ে প্রমাণ লোপাট করে ফেলা, এদের কাছে জলভাত। তা ছাড়াও, পালাতে গিয়ে যদি ধরা পড়ে যায়! শর্মার লোক নিশ্চয় সর্বত্র আছে। অন্যদিকে সুদীপ্তরা পুলিশকে খবর দিয়েছে, পুলিশফোর্স যদি এসে হাতেনাতে ধরে ফেলতে পারে, তবে ওদের অপরাধী প্রমাণ করে শাস্তি দেওয়া অনেক সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু ইদানীং পুলিশ সম্পর্কে যা সব পড়ে খবরের কাগজে, তাতে পুলিশকেও ভরসা করা যায় না। যত চোর বদমাশদের সঙ্গে ওদের সাঁট থাকে, মাসচুক্তি থাকে। হয়তো গা-ই করবে না, বা জেনেবুঝেও সব চেপে যাবে। একটাই যা আশার কথা, মনাস্ট্রির ভেতরে একজন লামা খুন হলে প্রশাসনকে নড়েচড়ে বসতেই হবে, নইলে পাবলিক খেপে যাবে। এই চান্সে ওদের প্রাণটা যদি বেঁচে যায়!

মালা রাতের খাবার নিয়ে আসে, শোনো, এভাবে বসিয়ে বসিয়ে প্রতিবেলা খাবার দিতে পারবো না বলে দিচ্ছি। এখনও বলছি, ভালোয় ভালোয় সব বলে দাও। আর এই যে ম্যাডাম, শর্মা বলে গেল কাল সকালেই তোমাকে আসলি জেরা করবে, সেই জেরা

যে কী খতরনাক তা তো তুমি বুঝতে পারছ না, তাই এত বড়ো বড়ো বাতেল্লা দিচ্ছ, মালা মুচকি হাসে, তখন দেখব কোথায় যায় তোমার এত রোয়াব।

একটা শীতল স্রোত মেঘনার শরীর দিয়ে বয়ে যায়, রেপ মার্ডার এসব এতদিন শুধু খবরের কাগজে আর টিভিতে দেখেছে, সেগুলো যে ওর জীবনে কখনও ঘটতে পারে, সে কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। যে কোনও দুর্ঘটনা দূর থেকে দেখতে একরকম, তার ভয়াবহতায় শিউরে ওঠা এক জিনিস। কিন্তু নিজে যতক্ষণ না তার শিকার হয়ে পড়ে, মানুষ তার আঘাত প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। আজ সারাদিন ধরে দফায় দফায় এদের অত্যাচার সহ্য করেছে, তার ওপর মালার মুখে সেই ম্যানেজারের স্ত্রীর ঘটনা শোনার পর থেকেই এমনিতেই একটা তিক্ত ভাবে ওর মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে, এই মুহূর্তে টের পেল ওর ভয় করছে, ভীষণ ভয় করছে। সত্যিই যদি শর্মা ওকে রেপ করে বা করতে উদ্যতও হয় ও কি নিজেকে সামলাতে পারবে! উগরে দেবে না সব কথা! দূর থেকে অনেক বড়ো বড়ো কথা বলা যায়, কিন্তু ঘটনার মধ্যে নিজেই ঢুকে পড়লে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যায়। মেঘনা ওপরের পাটি দিয়ে নিচের পাটির দাঁত চেপে ধরে, কিছুতেই নার্ভাস হলে চলবে না। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে হবে।

এখন দমবন্ধ অপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। প্রতিটা মিনিট যেন ঘণ্টার মতো লম্বা মনে হচ্ছে। ওরা কখন যে ঘুমাবে, কখন আসবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ! এই মুহূর্তে পালিয়ে যাওয়ার ফন্দি আঁটা ছাড়া কারও মাথাতেই আর কোনও চিন্তা নেই। মেঘনা দাঁত দিয়ে নখ কাটে। সুদীপ্ত কেবলি আঙুল মটকাচ্ছে। সব্বার ভেতর একটা অস্থির অস্থির ভাব। কাছেই একদল শেয়াল ডেকে উঠল। এখন কত রাত? দশটা? এগারোটা, নাকি আরও বেশি?

দিদি, এরা তো একদম বিষগিট্টু দিয়ে রেখেছে। এ খুলতে খুলতেই রাত কাবার হয়ে যাবে, সুদীপ্ত দড়িদড়া নিয়ে আনাড়ির মতো টানাটানি করতে গিয়ে দেখে বাঁধন আরও এঁটে বসে যাচ্ছে।

দাঁড়ান, দাঁড়ান, এভাবে হবে না, আমি দেখছি কী করা যায়, লোকবাহাদুরের দুটো চোখ শিকারি বাজের মতো দৃষ্টিতে ঘরের সমস্ত আসবাবের ওপর নজরদারী চালাতে থাকে।

আরে, ওই তো একটা টিনের পাত বেরিয়ে আছে জানলার থেকে...

লোকবাহাদুরের কথা শেষ হয় না। হঠাৎই পায়ের নিচের মাটি দুলতে শুরু করে। সে কী ভয়ংকর ঝাঁকুনি রে বাবা, মনে হচ্ছে প্রচণ্ড আক্রোশে মাটি যেন চিৎকার করছে, যেন তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এই সৃষ্টিকে ধ্বংস না করা অব্দি তার শান্তি নেই। সমতলের মানুষ মেঘনা, সুদীপ্ত এরকম ভূমিকম্পের সঙ্গে একেবারেই পরিচিত নয়। কাঠের ঘরটা যেন এই মুহূর্তেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। কেউ আর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। মেঘনা আতঙ্কে চিৎকার করে ঘরের একটা খুঁটি জড়িয়ে ধরে, সুদীপ্ত ধপ করে মাটিতে পড়ে যায়, কেবল ভূমিপুত্র লোকবাহাদুর অবিচলিত। এমন সময় গুড়গুড় গুড়গুড় শব্দ, সমস্ত আকাশ যেন ভেঙে পড়ছে মাথার ওপর।

সর্বনাশ! লোকবাহাদুর বলে, ধস নামছে। এখানে ভূমিকম্প হলেই ধস নামে।

সোনাম আর রোহিতের আর্ত চিৎকার শোনা যায়, নিকলো নিকলো, জলদি বাহার নিকলো। ঘটনার আকস্মিকতায় সকলেই বিপন্ন বোধ করছে। ওরা দৌড়ে এসে ঘরে ঢোকে। মেঘনা পালাবে কী, ভয়েই অস্থির। সুদীপ্তও থরথর করে কাঁপছে। পুরো হতচকিত হয়ে গেছে। এতদিন ধসের কথা শুধু খবরের কাগজেই পড়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে কী করতে হয় তার কিচ্ছুটি জানা নেই। এই সময়



রোহিত, সোনাম আর মালার তৎপরতা দেখতে পেল। নিমেষে দড়িদড়া খুলে ওদের হাত ধরে টেনে বাইরে এনে গাড়িতে তুলল। ভূমিকম্পের তীব্রতায় গাড়িটাও জোরে জোরে দুলছে।

আভি ইঁহাসে নিকালনা পড়েগা, রোহিত গাড়ি ছুটিয়ে দেয়।

যেতে যেতে গাড়ির জানলা দিয়ে হালকা চাঁদের আলোয় মেঘনা দেখে, পাহাড়ের ঢালে যেই ঘর দুটোয় ওরা ছিল, সেইসব নিয়ে হুড়মুড় করে ধসে পড়ছে পাহাড়, দশদিক কাঁপিয়ে শুধু গুমগুম শব্দ। গাছপালা পাথর মাটি সব কিছু সমুদ্রের বিশাল একটা ঢেউয়ের মতো নেমে আসছে। আজ যেন পৃথিবীর মৃত্যুদিন উপস্থিত। সমস্ত সৃষ্টি আজ রসাতলে চলে যাবে। ভেতরে একটা তুমুল কম্পন অনুভব করে মেঘনা। সুদীপ্তর অবস্থাও তথৈবচ, ভয়ে চিৎকার করে উঠতেও যেন ভুলে গেছে। আর একটু দেরি হলেই যে কী অবস্থা হত, ভাবতেই মেঘনার হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায়। কারোর মুখে কোনও কথা নেই। রোহিত স্পিডে গাড়ি চালানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু ওর হাতও স্টিয়ারিং ধরে ঠকঠক করে কাঁপছে।

খুব বাঁচা বেঁচে গেছি। সোনাম উত্তেজিত স্বরে বলে। প্রকৃতির কাছে মানুষ কতটা অসহায়, আজ প্রথম উপলব্ধি করল মেঘনা। এরা এখানকার মানুষ বলে একটুতেই আঁচ করেছিল, নইলে...

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, নাকি পাঁচ ঘণ্টা, কতটা সময় কেটে গেছে, কারোর কোনও হুঁশ নেই। কেবল এই ভয়ানক জায়গা থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে যেতে হবে। রোহিত স্পিড তোলার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে, কিন্তু একে রাত্রিবেলা, তায় এই পাহাড়ে রাস্তাঘাটের অবস্থাও বেহাল, দশ বারোর বেশি এগোয় না স্পিডোমিটারের কাঁটা।

জুলুকের দিকে যাবি না। আর্মি আছে, দেখলেই ধরে ফেলবে। সোনাম বলে।

শালা উল্লু কাঁহিকা, হর মামলেমে টাং লড়াতা হ্যায়। বস আমাকে নেক্সট শেলটারের কথা আগেই বলে দিয়েছে। তুই এই হারামিগুলোর চোখ বেঁধে দে। শাল্লা, সবকটা পুলিশের খোচড়।

সে কী! আঁতকে ওঠে সোনাম। ওই শালা হারামির বাচ্চা ড্রাইভারটা কোথায় গেল! গাড়িতে তোলার সময় খেয়াল করিনি তো। ধসে তলিয়ে গেল নাকি!

ঘচাৎ করে ব্রেক কষে রোহিত। তলিয়ে গেল মানে, আমরা তো ধস নামার আগেই ওই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছি। আর ও তলিয়ে যাওয়ার বান্দা! লোকাল লোক, নির্ঘাত পালিয়েছে। যত্তসব আলফাল পাবলিক নিয়ে কাজকারবার! আমি গাড়ি বের করছি, সেই ফাঁকে জলজ্যান্ত একটা লোক ভেগে গেল, সবদিকে আমাকেই নজর দিতে হবে! এবার শর্মা আর আমাদের জিন্দা রাখবে! এক্ষুনি ফোন লাগা। রোহিত স্টিয়ারিংয়ের ওপর আক্রোশে একটা বাড়ি মারে।

সোনাম ফোন করে মিনমিনে গলায় বলে, স্যার বিরাট লফড়া হয়ে গেছে, এইমাত্র ধস নেমেছে আমাদের এখানে, আর সেই সুযোগে ওই লোকবাহাদুর পালিয়েছে নাকি ধসের সঙ্গে তলিয়ে গেছে বুঝতেই পারছি না।

তোদের আজকে কুত্তা দিয়ে খাওয়াব, ফোনের ওপাশে এত জোরে চিৎকার করে কথা বলে শর্মা যে, এদিকের সবাই শুনতে পায়। সোনাম এমনিতেই পরিস্থিতির চাপে নার্ভাস হয়ে ছিল, এবার কাঁপতে কাঁপতে ফোনটা রোহিতকে ধরিয়ে দেয়।

শোন নেক্সট শেলটারে পৌঁছেই তুই আমাকে ফোন করবি। আমি এদিকে লোক লাগাচ্ছি। ও শালা লোকবাহাদুর বহুত টেঁটিয়া আদমি আছে, নোরবু আমাকে বলেছে। ও পালিয়েই গেছে। তুইও শালা নিকম্মা কাঁহিকা, একটা কাজও যদি তোদের দিয়ে ঠিকমতো হয়। তোদের ব্যবস্থাও হচ্ছে।

রোহিতের সব মাস্তানি শর্মার ফোনের সামনে নস্যাৎ হয়ে যায়। তোতলাতে তোতলাতে

কোনোরকমে, জি স্যার, জি স্যার বলে ফোনটা কেটে গাড়ি স্টার্ট করে।

এদিকে বৃষ্টি নেমেছে মুষলধারে। সঙ্গে ঘন ঘন বাজ পড়ছে। আকাশ যেন ছিঁড়েখুঁড়ে ভেঙে পড়বে মাথার ওপর। পথ আর দেখা যায় না, প্রায় হাঁটার মতো স্পিডে গাড়ি চালাতে হচ্ছে।

শালা, কপাল যেদিন খারাপ যায়, সবদিক দিয়েই যায়। বস তো চেল্লাচ্ছে, আর এদিকে আমাদের ফাটছে। এক দিন, স্রেফ একটা দিন করুক আমাদের মতো কাজ, তারপর বুঝব কার কত হিম্মত, রোহিত ফগলাইট জ্বালতে জ্বালতে রাগে ফুঁসতে থাকে।

মাই গড! আব কেয়া হোগা! ঘচাৎ করে ব্রেক কষে, চিৎকার করে ওঠে রোহিত। গাড়ির আলোয় ওরা সবাই দেখে সামনেও বিশাল ধস নেমে সম্পূর্ণ রাস্তা বন্ধ হয়ে আছে।

বাল বাল বাঁচ গ্যায়া, সোনম বলে। কিরে এবার কী করে যাবি?

মেঘনার সেই 'মেঘনাদবধ কাব্য' মনে পড়ে যায়। দেবতাও বিমুখ হলে মানুষ তখন কী করতে পারে! তবে কি সেই স্বপ্নটাই সত্যি? হবেও বা, নইলে সবকিছু ঠিকঠাক চললে এতদিনে কোথায় কাজ গুছিয়ে ফিরে যাওয়ার কথা, এর ভেতর কিডন্যাপ, ধস, এই পাতাল ভেদ করা বৃষ্টি, কেউ যেন ওর সমস্ত কাজ পণ্ড করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। সেই স্বপ্নটাতে যেন তারই ইঙ্গিত ছিল। সমাজের ক্ষতগুলো লোকসমক্ষে আনার চেষ্টা করতেই তারা যেন স্বমূর্তি ধারণ করে ওদের ওপর পরের পর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এই যে এতক্ষণ বসে বসে পালিয়ে যাওয়ার এত ছক কষল, তাও কোনও কাজে এল না। ধস না নামলে ওরা এতক্ষণে কতদূর চলে যেত! একটাই যা ভরসা, লোকবাহাদুর পালাতে পেরেছে। কথাটা মনে হতেই মেঘনার বুকের ভেতর ধক করে ওঠে, সত্যিই পালাতে পেরেছে তো, নাকি প্রকৃতির এই বিধ্বংসী খেলায় তলিয়ে গেছে অতলস্পর্শী খাদে? আর পালিয়ে যাবেই

বা কতদূর, শর্মা খবর পেয়ে গেছে, ধরতে পারলে জানে মেরে দেবে সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু ও এখানকার মানুষ, তায় আবার ড্রাইভার, পথঘাট নিজের শরীরের মতো চেনে, ওকে নিশ্চয়ই অত সহজে ধরতে পারবে না। আশায় বাঁচে চাষা। ও ঠিক একটা না একটা কিছু উপায় করতে পারবেই।

এই সবাই নেমে এস। ঘুরপথে হেঁটে যেতে হবে। মালা, তুই মেয়েছেলেটার হাত ধরে নিবি। সোনাম তুই এই শালা পুলিশের টিকটিকিটাকে ধর। আমি গাড়িটা জঙ্গলের ভেতরে লুকিয়ে রেখে আসছি, রোহিতের কথায় মেঘনার ভাবনায় ছেদ পড়ে।

এই বৃষ্টির মধ্যে এই পাহাড়ি রাস্তায় এত রাতে এরকম ঠান্ডার ভেতর হাঁটতে হবে, এও ছিল কপালে! মেঘনা বলে, রাত্তিরটা গাড়িতেই কাটাও না বাপু, এর মধ্যে আমি হাঁটতে পারব না।

গুলু গুলু, রোহিত ঝপ করে মেঘনার গালদুটো টিপে দেয়, মামুনি আমার, কোথাকার হিরোইন এসেছেন মুম্বই থেকে! আর একটা কথা বললে দেব খোপরি উড়িয়ে। হাঁটতে পারব না, ইল্লুশ! কথায় কথায় ইল্লুশ বলা রোহিতের একটা মুদ্রাদোষ।

শুরু হল সেই অন্ধকারে পথ চলা। পথ বললে ভুল হবে, সবটাই চোরাবাটো, অর্থাৎ পাহাড়ের লোকেদের পায়ে হেঁটে চলাফেরা করার সংক্ষিপ্ত পথ। সে পথে সমতলের মানুষের এমনিতেই চলতে দম বেরিয়ে যায়, তার ওপর বৃষ্টিতে পুরো রাস্তা পেছল হয়ে আছে। পাশাপাশি দুজন মানুষের চলার মতোও জায়গা নেই। একদিকে পাহাড়, সেদিক থেকে যে-কোনও মুহূর্তে নেমে আসতে পারে ধস, অন্যদিকে গভীর খাদ, একবার পা স্লিপ করলেই কোন অতলে তলিয়ে যাবে। রোহিত একটা বড়ো এমারজেন্সি লাইট নিয়ে পথ দেখিয়ে আগে আগে চলল।

১১

সবাই ধসের আতঙ্কে মহা চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের জানপ্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত। লোকবাহাদুর দেখল এটাই সুযোগ। ওদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে পিছু হঠতে থাকে, কয়েক পা যেতে পারলেই একটা বার্চ গাছের জঙ্গল, ওর হুঁসিয়ার চোখ আগেই নজর করে নিয়েছে। দমবন্ধ করে এক পা এক পা করে পিছাতে থাকে, যাতে করে জঙ্গলটা নাগালে এসে যায়, একবার জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়তে পারলে আর ওকে পায় কে! শয়তানগুলো ভয়ে বেহুঁশ হয়ে আছে, এখনও কিচ্ছু টের পায়নি। জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে এবার একটু দম নেয়, সবটা ঠান্ডা মাথায় ছকে নিতে হবে। এরা যখন গাড়ি নিয়ে এখানে এসেছে, মেইন রোড এখান থেকে বেশি দূরে হবে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা দেখে দিক নির্ণয় করে। এরপর স্থানীয় মানুষ লোকবাহাদুরের আর বেশি কিছু ভাবতে হয় না। মেইনরোড কোন দিকে হতে পারে আন্দাজ করে ছুটতে শুরু করে। একবার বড়ো রাস্তায় পোঁছোতে পারলে আর চিন্তা নেই, এ অঞ্চলের সব ড্রাইভার তাকে চেনে। বার্চের জঙ্গলটা পার হওয়ার আগেই আকাশ ফালাফালা করে বিদ্যুৎ চমকে উঠল, সেই সঙ্গে তুমুল শব্দে বাজ পড়ছে। বৃষ্টি নামল বলে। লোকবাহাদুর মরিয়া হয়ে ছুটতে থাকে। থ্যাংক গড! জঙ্গল যেখানে শেষ হয়েছে তার নিচেই গাড়ির রাস্তা। সে অভ্যস্ত পায়ে উৎরাই বেয়ে দ্রুত নেমে যায়। ঘড়িতে এখন কটা বাজে, আর

কি কোনও গাড়ি পাবে? অধৈর্য হয়ে মাটিতে পা ঠোকে লোকবাহাদুর। কপাল ভালো, খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটা মিলিটারির জিপ জুলুকের দিক থেকে আসছে। ও রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে দু-হাত তুলে। গাড়িটা ব্রেক কষতে বাধ্য হয়। ও দৌড়ে গিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে। সেই আঠেরো উনিশ বছর বয়েস থেকে এই রুটে গাড়ি চালায় বলে, এমনকি মিলিটারির ড্রাইভাররাও ওকে চেনে। ওরা লোকবাহাদুরকে জিপে তুলে নেয়। আর্মির লোকেদের প্রশ্নের উত্তরে ও কিন্তু ঘুণাক্ষরেও আসল ঘটনা কিছুই বলে না। বাল্যবন্ধু নোরবুর আচরণ ওকে অনেক বড়ো শিক্ষা দিয়ে দিয়েছে। ওদের বলে, এই এলাকায় এক আত্মীয়ের বাড়ি এসেছিল, তারপর বাড়ি থেকে জরুরি ফোন আসায় এই অসময়ে ফিরতে হচ্ছে। রংগলিতে যখন এসে পৌঁছায় লোকবাহাদুর, তখন ঘড়ির কাঁটা তিনটে ছুঁই ছুঁই। একটা ওষুধের দোকান সারারাত খোলা থাকে, সেখান থেকে তমালের কোয়ার্টারে ফোন করে।

ওর নাম শুনে তমাল একবারেই চিনতে পারে। ওর ভেতরে দপ করে একটা আশার আলো জ্বলে ওঠে। ওর পালিয়ে আসার কথা জানতে পেরে সম্পুর্ণ ছবিটা তমালের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আপনি ওখানেই ওয়েট করুন, আমার গাড়ি যাচ্ছে, এখন আপনার হেঁটে আসা নিরাপদ না।

পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই একটা পুলিশের জিপ এসে দাঁড়ায় ওষুধের দোকানের সামনে।

লোকবাহাদুরকে নিয়ে রওনা দেয়। কিন্তু ওরা কেউই খেয়াল করে না, অন্ধকারের মধ্যে গা মিশিয়ে একটা কালো গাড়ি ওদের ফলো করে চলে।

এক নিশ্বাসে তমালকে সব কথা বলে লোকবাহাদুর হাঁফাতে থাকে। তমাল ওকে জলের গ্লাস এগিয়ে দেয়। জল খেয়ে একটু ধাতস্থ হয়ে লোকবাহাদুর বলে, আমি প্রায় কুড়ি বছর ধরে এই ইস্ট সিকিমে গাড়ি চালাচ্ছি, সবাই আমাকে চেনে।

গুরুংস্যারের মোবাইল নাম্বারও আমার কাছে আছে, এর আগে যখনই কোনও ঝুটঝামেলা হয়েছে, ওনাকে ফোন করেছি, উনিও সাধ্যমতো হেল্প করেছেন। আজকেও প্রথমে গুরংস্যারকেই ফোন করেছিলাম, কিন্তু উনি কিছু শুনতেই রাজি হলেন না। ফলে আমি বাধ্য হয়ে এত রাতে আপনাকে ফোন করি। সরি স্যার, আপনাকে ডিস্টার্ব করলাম। কিছু করার ছিল না, আমার ভীষণ বিপদ স্যার, নোরবুর লোকেরা আমাকে ধরতে পারলে জানে মেরে দেবে। আমি বালবাচ্চাআলা আদমি। আমাকে বাঁচান। সুদীপ্ত ভাইয়া আর মেঘনা ম্যাডাম এখনও ওদের খপ্পরে। ওরা অলরেডি সুদীপ্ত ভাইয়া আর আমাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে। ওরা ডেঞ্জারাস লোক স্যার। ওই শর্মা এই অঞ্চলের একজন দাগি স্মাগলার। আর নোরবুর ক্ষমতা তো আপনি জানেনেই। আপনি এক্ষুনি কিছু করুন স্যার। আমি আপনাকে সব দেখিয়ে দেব, ওরা কোথায় রেখেছিল আমাদের, সব বলে দেব।

তমাল এমনিতেই এই কেস নিয়ে পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে আছে, তার ওপর গুরুং-এর নিস্পৃহতার কথা শুনে প্রচণ্ড খাপ্পা হয়ে স্বমূর্তি ধারণ করে, হ্যালো, মিস্টার গুরুং, আপনি কি জানেন না এই মেঘনা সান্যাল কিডন্যাপিংয়ের কেসে লোকবাহাদুর একজন ইমপর্ট্যান্ট উইটনেস, তারপরও আপনি ওর ফোন কলকে কোনও গুরুত্ব দেননি? আমি কিন্তু এর জন্য আপনাকে শো কজ করতে পারি।

না স্যার... সরি স্যার... আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, এবারের মতন মাফ করে দিন। আর হবে না, গুরুং তোতলাতে থাকে।

আপনাকে মাফ করে দিলেই কি যে সময়টা নষ্ট হল সেটা ফিরে আসবে? এক্ষুনি জিপ রেডি করুন, আমি এদিক থেকে রওনা দিচ্ছি। পথে মিট করে নেব। আপনি থানার সামনে ওয়েট করুন। আর স্নিফার ডগ নিয়ে যেন লোক থাকে।

লোকবাহাদুরের কাছ থেকে সব ঘটনা জেনে তমাল পুরোপুরি নিশ্চিত হয়, মেঘনা এবং সুদীপ্ত এই চুরি বা খুনের সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত নয়। এত উত্তেজনার মধ্যেও একটা তৃপ্তির বোধ ওর মনের ভেতর খেলে যায়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে তমালের এসইউভি লোকবাহাদুর নির্দেশিত পথে রওনা হয়ে যায়।

১২

মালা জানে যে, মেঘনার কিছু হয়ে গেলে শর্মা ওকে আর আস্ত রাখবে না, কারণ মেঘনাই ওই পটগুলোর কাছে পৌঁছনোর একমাত্র চাবিকাঠি। তাই শক্ত করে মেঘনার হাত ধরে থাকে, আমি যেখানে যেখানে পা ফেলব, তুমিও ঠিক সেখানেই পা ফেলবে। একবার স্লিপ করলে কিন্তু একদম শেষ। পাশেই খাদ। এদিকে আকাশ ফুটো করে বৃষ্টি নেমেছে। চোখে কিছুই ঠাহর হয় না। নেহাত মালা আছে বলে। মেঘনা এই মুহূর্তে বুঝতে পারে শখের ক্যাম্পে গিয়ে ওরকম দু-চারবার ট্রেকিং করা আর সত্যিকারের দুর্গম পাহাড়ি রাস্তায় এই বৃষ্টি মাথায় করে হেঁটে যাওয়ার মধ্যে আসমান জমিন ফারাক। তাও যতটা সম্ভব মালার ফুটস্টেপ খেয়াল করে করে হাঁটার চেষ্টা করে। সুদীপ্ত বেচারার হাল আরও খারাপ, একে তো চোখ বাঁধা, তার ওপর হাঁটতে গিয়ে সামান্য হোঁচট খেলেও সোনাম ওকে বিচ্ছিরিভাবে ধাক্কা দিচ্ছে, কটুক্তি করছে। বার কয়েক তো পা স্লিপ করে উপুড় হয়ে পড়েই গেল। সোনাম ওকে উঠতে সাহায্য করা তো দূরের কথা, বেদম গালিগালাজ দিতে থাকে। কোনোমতে চার হাতপায়ে হামাগুড়ি দেওয়ার মতো করে হাতের আন্দাজে আন্দাজে গুঁড়ি মেরে আস্তে আস্তে সুদীপ্ত উঠে দাঁড়ায়।

আর রাগ চাপতে না পেরে মেঘনা বলেই ফেলে, যত্ত সব জানোয়ারের দল। মালা প্রচণ্ড জোরে ওর ধরে থাকা হাতটা মুচড়ে দেয়, শালি, এত্ত মার খেলি

তবু তোর তেজ যায় না! দাঁড়া বস আসুক, তোকে মজা চাখাচ্ছি। এদিকে বৃষ্টিতে সবার কাপড়জামা ভিজে চুবচুস। জ্যাকেট, জিনসের প্যান্ট ভিজে আরও ভারি হয়ে গেছে। একটা রুমাল পর্যন্ত শুকনো নেই। বৃষ্টির ফোঁটা তো নয়, যেন হিম ঝরছে অঝোর ধারায়। তার মধ্যে হাঁটতে গিয়ে ওই ঠান্ডা জলে পা অসাড় হয়ে আসছে, পায়ের পেশিতে ক্র্যাম্প ধরে যাচ্ছে। আর কত দূর! মেঘনা আর পারছে না। হাত পা ভেঙে আসছে। এরা এই অবস্থাতেও দিব্যি হেঁটে যাচ্ছে। একেই বলে অভ্যেস। কতক্ষণ হেঁটে চলেছে মেঘনার কোনও হুঁশ নেই। সময় যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। ঘণ্টা মিনিটের কোনও হিসেব নেই।

এই সময় সামনে একটা ঝোরা। ঝোরা দেখে রোহিত মনে মনে খুব খুশি, যদিও সেটা ওর হাবেভাবে কিছুই বুঝতে দেয় না। ওর আগের অভিজ্ঞতা থেকে জানে জল পেরিয়ে গেলে পুলিশের কুকুরগুলো পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে যাবে, ওদের নাকে আর কোনও গন্ধ ধরা পড়বে না।

বৃষ্টির জলে ঝোরা তখন প্রায় নদীর মতো চওড়া হয়ে গেছে। আর যেমন তীব্র স্রোত, তেমন ঠান্ডা কনকনে জল। মেঘনার মনে হয় পা দুটো আর নিজের পা নেই, ওদের ওপর তার কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। টলতে টলতে কোনোমতে ঝোরাটা পার হয়। এদিকে রোহিত দ্বিগুণ উৎসাহে তাগাদা দিচ্ছে, এই, সব পা চালিয়ে, রাতের মধ্যে নতুন ডেরায় না পৌঁছতে পারলে বস কেটে টুকরো টুকরো করে ভাসিয়ে দেবে।

তখন ভোরের আলো ফুটব ফুটব করছে, বৃষ্টিও অনেকটা ধরে এসেছে। ওরা একটা একতলা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

কি রে মালা চিনতে পারছিস? রোহিত চোখ মটকে প্রশ্ন করে।

না চেনার কী আছে? ব্যস, অব জ্বলে পে আউর নমক মৎ ছিড়কাও। মালার মুখে ছায়া ঘনিয়ে আসে।

ওর কঠোর ব্যক্তিত্ব কেমন যেন টাল খেয়ে যায় রোহিতের কথায়।

মেঘনার বাড়িটা দেখে একটু শান্তি হল। এই মুহূর্তে যদিও ওদের জীবনমৃত্যুর কোনও ঠিকঠিকানা নেই, তবুও মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি একটু ভালোভাবে থাকা। ভেতরে ঢুকে মেঘনা অবাক। একদম ওয়েল ফার্নিশড একটা বাংলো। ঘরে ঘরে খাট, ওয়ার্ডরোব, আয়না, এমনকি রুমহিটার অব্দি আছে।

জামাকাপড় ছাড়তে গিয়ে মেঘনা দেখে ভিজে কাপড় যেন গায়ের দ্বিতীয় চামড়া হয়ে আটকে গেছে। কোনোমতে সব ছেড়ে একটা কম্বলের তলায় ঢুকে পড়ে। মাথা ছিঁড়ে পড়ছে। একটা জ্বর জ্বর ভাব। এভাবে এত ঠান্ডায় এরকম বৃষ্টিতে জীবনে ভেজেনি। পায়ের গোছের কাছে কীরকম কুটকুট করছে, মেঘনা হাত দিয়ে চুলকাতে গিয়ে দেখে হাতটা ভিজে চ্যাটচ্যাটে হয়ে গেল। চোখের সামনে আনতেই দেখে রক্ত! মেঘনা লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে,

মালা! মালা!

মালা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে আছে আছে। কোনও কথা বলছে না।

দেখো কী হয়েছে, নিশ্চয় জোঁক ধরেছে, মেঘনা মালাকে ওর পা-টা দেখায়।

মালা কোনও উত্তর না করে চলে যায়। কিছুক্ষণ বাদে যখন এল ওর হাতে এক খাবলা নুন।

দেখি, কোথায় কোথায় জোঁক ধরেছে? তুমি এখন আমাদের ভিআইপি, মহারানির খিদমত করে করে জান কয়লা হয়ে গেল, কী করে যে তোমাদের জোঁক ধরে, পরে আছো তো দামি বিদেশি জুতো। আর আমি এই এতটা পথ হেঁটে এলাম সাধারণ কেডস পরে। তোমাদের রক্ত মাইরি হেব্বি মিষ্টি।

সত্যিই নুন দিতেই জোঁকগুলো ছেড়ে গেল। আরও দু-তিনখানা জোঁক মালার অভিজ্ঞ চোখ খুঁজে পেয়েছে। মেঘনা মনে মনে ভাবে, সুদীপ্তটা যে কী করছে! আগের ঘরটা ভাঙাচোরা হোক আর যাই

হোক, তবু তো এক ঘরে, একসঙ্গে ছিল। আর এই বাড়িতে ঢোকার পর ওরা সুদীপ্তকে অন্য ঘরে রেখে দিয়েছে। রাস্তায় বেচারা কয়েকবার পড়ে গেছে, কেটে ছড়ে গেল কিনা কে জানে। তারপরই সবটা পরিস্থিতি মাথায় আসতেই মেঘনার মুখে একটা উদাসীন হাসি ফুটে ওঠে, যেখানে আর কতক্ষণ বেঁচে থাকবে তারই ঠিক নেই, সেখানে এইসব তুচ্ছ কাটাছেঁড়া নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ! তবু সুদীপ্তর প্রতি মায়ায় ওর মনটা দ্রব হয়ে ওঠে। ওর তো এই বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার কোনও দরকার ছিল না, শুধুমাত্র মেঘনার জন্যই এতটা করেছে।

কিন্তু সারারাত ধরে এভাবে হেঁটে গা আর চলছে না। শরীর এখন চাইছে একটা লম্বা ঘুম। কিন্তু ঘুমানোর মতো মানসিক অবস্থাই নেই। লোকবাহাদুর কি পুলিশের কাছে অব্দি পৌঁছতে পেরেছে, নাকি মাঝ পথেই শর্মার লোক ওকে ধরে ফেলেছে। তীব্র উৎকণ্ঠায় ভেতর মেঘনার মাথাব্যথাটা আবারও প্রবলভাবে জানান দেয়। এভাবে আর কতক্ষণ থাকতে হবে, আর কত দিন? আদৌ পালানো যাবে তো!

কিছুক্ষণ বাদেই মালা খাবার নিয়ে ঘরে ঢোকে,

নাও এবার খেয়ে নিয়ে আমাকে উদ্ধার কর দেখি।

সেই রুটি সবজি নয়, গরম ধোঁয়া ওঠা খিচুড়ি। এত কষ্টের মধ্যেও মেঘনা টের পায় খাবার দেখে ওর লোভ লাগছে। পরক্ষণেই মনে হয় এই কি শেষ খাওয়া, সেইজন্যই ওরা ভালো খাবার খেতে দিল! তবু, খিদে বড়ো বালাই। মেঘনা গপগপ করে খেতে থাকে। কিন্তু মনে হচ্ছে সত্যিই জ্বর এসে গেছে। কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব। এরা কি চাইলে কোনো ওষুধ দেবে! থাক গে, মরতে বসেছে, এখন আর কিসের ওষুধ, কিসের কী!

এদিকে সময় চলে যাচ্ছে অতি দ্রুত। পুলিশ কি আদৌ খবর পেয়েছে! এখনই যদি শর্মা চলে আসে, কী করবে মেঘনা? পুলিশ না আসা অব্দি যে করে হোক

শর্মাকে সামাল দিতে হবে। শর্মাকে কী বলে ভুলিয়ে রাখবে, শর্মা কি ছেলেমানুষ! একটা নৃশংস গুন্ডা। আর, পুলিশ আদৌ আসবে তো! কম্বলটা জড়িয়ে উঠে দাঁড়ায় মেঘনা। ঘরটার তিনদিকেই কাচের জানলা। পর্দা সরিয়ে দিতেই দিনের আলো ঝপাং করে ঘরে ঢুকে পড়ল। আহ, রোদ্দুর! যেন কোনোদিন রোদ্দুর দেখেনি মেঘনা, সমস্ত শরীর দিয়ে শুষে নিতে চায় এই তাপ, এই উষ্ণতা। পুবের জানলার সঙ্গে গা ঠেকিয়ে দাঁড়ায়। হয়তো এই শেষ রোদ পোহানো, হয়তো এই শেষ সূর্য দেখা। মরতে তো হবেই তার আগে প্রকৃতির এই অকৃত্রিম আদর গায়ে মেখে নিতে দোষ কী! মালার দেওয়া গরম গরম খাবারের কারণেই হোক বা রোদের তাপের জন্যই হোক শরীরটা একটু চনমনে বোধ করে। এই উত্তাপ ছড়িয়ে যায় মনের ভেতরেও। ও ভীতুর মতো মরবে না। গতকালের বিভীষিকাময় রাত্রির স্মৃতি মুছে ফেলে ও এখন আবার সেই মেঘনা সান্যাল, যে শত আঘাতেও মচকায় না। এভাবে জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতটা সময় কেটে গেছে মেঘনার খেয়াল নেই।

হঠাৎ নজরে আসে, মালা রোহিতকে দুহাতে চেপে ধরে ঝাঁকি দিচ্ছে আর হাউহাউ করে কাঁদছে। এই বাড়িটাতে আসার পর থেকে এমনিতেই মালাকে একটু অন্যরকম লাগছিল। সেই রুক্ষ কঠিন মেয়েটার ভেতর থেকে যেন অন্য একটা মেয়ে বেরিয়ে এসেছে। মেঘনা খুব সাবধানে যাতে একটুও শব্দ না হয়, এভাবে আস্তে আস্তে জানলাটা খুলে দেয়। এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া ধাঁ করে ওর হৃদপিণ্ডের ভেতর অব্দি ঢুকে যায়। কথাবার্তা বিশেষ বোঝা যাচ্ছে না, মালা কাঁদতে কাঁদতে মাটির ওপর বসে পড়েছে। দু-হাতে নিজের কপাল চাপড়াচ্ছে। মেঘনা মাথাটা একটু বাড়িয়ে দেয় শোনার জন্য, মালা শুধু বলছে, আমি এর বদলা নেবই নেব। আর রোহিত ওকে শান্ত করার জন্য পাশে বসে পিঠে হাত বোলাচ্ছে। একসময় আর না পেরে ঠাস করে একটা চড় মেরে বসল মালাকে।

মালাও ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতো দমাদ্দম কিল ঘুঁষি মারতে থাকে রোহিতকে। তারপর আস্তে আস্তে কেমন যেন শান্ত নিস্তেজ হয়ে ওখান থেকে চলে যায়।

মেঘনা আবার আস্তে করে জানলাটা বন্ধ করে দেয়। ওরা নিজেদের মধ্যে মারপিট করছে, তার মানে নির্ঘাৎ কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছে। এটাই সুযোগ, মেঘনা ভাবে। সুদীপ্ত যে কী করছে, কে জানে! এদের একজনকে পটিয়ে পাটিয়ে হাত করতে পারলে কী ভালোই না হত! দেখা যাক, ও নিজেই চেষ্টা করবে। এভাবে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকার বান্দা ও নয়। ঘরের দরজা হাত দিয়ে ঠেলে দেখে বাইরে থেকে বন্ধ করা। আচ্ছা, পেছনের ওই দরজাটা কিসের? মেঘনার যেই ভাবা সেই কাজ। একটা হ্যাচবোল্ট দিয়ে দরজাটা আটকানো। তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজাটা খোলে, একটা বাথরুম। একদম আধুনিক স্টাইলে কমোড, শাওয়ার সবকিছু দিয়ে সাজানো। সারারাত হেঁটে পায়ের পেশিতে খিঁচ ধরে আছে, মেঘনা তবুও কষ্ট করে কমোডের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে স্কাইলাইটটা খোলার চেষ্টা করে। কিন্তু নাহ, মাঝ বরাবর একটা লোহার শিক দিয়ে আটকানো।

ঠিক এই সময় ঘরের দরজা খুলে যায়, মেঘনা কমোডের ওপর থেকে নামারও সুযোগ পায় না, রোহিত এসে ঘরে ঢোকে। মেঘনাকে এই অবস্থায় দেখে রোহিত ওর চুলের মুঠি ধরে টেনে নামায়,

শালি কুত্তি, এত মার খেলি তবু তোর হারামিপনা যায় না। পালানোর চেষ্টা হচ্ছিল! দাঁড়া, এক্ষুনি বসকে ফোন করছি। তোকে যদি বাজারে না নামিয়েছি তো আমার নামও রোহিত না।

রাগে অপমানে মেঘনার চোখে জল চলে আসে, দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলায়। টানাটানিতে গায়ের কম্বল প্রায় খুলে এসেছে, রোহিতের লোলুপ দৃষ্টি ওর অনাবৃত দেহের খাঁজে খাঁজে শকুনের মতো ঘুরছে। ঘেন্নায় মেঘনার সমস্ত শরীর রি রি করে ওঠে। তাড়াতাড়ি কম্বলটা ভালোভাবে জড়িয়ে নেয়।

শোনো ম্যাডাম, এখন আটটা বাজে, বস দশটার দিকে আসবে। আজকে যদি পটগুলোর খবর না দাও তো তোমার হালত কী করে দেখে নিয়ো। আমাদের অত বোকা ভেবো না। একটা মেয়েছেলের পেট থেকে কী করে কথা বের করতে হয়, আমরা ভালোমতো জানি। আর, সাবধান, ফের যদি দেখি পালানোর চেষ্টা করেছ, তো গুলি করে জীবনের মতো খোঁড়া করে দেব।

রোহিত চলে যাওয়ার পরও মেঘনার আতঙ্ক কাটতে চায় না। জানলায় মেলে দেওয়া আধভেজা কাপড়-জামাগুলোই পরে নেয়। তারপরও কী এক ভয় ওকে গ্রাস করে। বাবা-মার মুখ মনে পড়ে যায়, মনে পড়ে কলকাতার জীবন, ওর নিজের উপার্জনে কেনা ছোট্ট ফ্ল্যাটটার কথা, ইজেল ক্যানভাস রং তুলি সবকিছুর জন্য বুক ফেটে কান্না আসে। আর কি কোনোদিন ফিরে যেতে পারবে! হয়তো এই পাহাড় জঙ্গলের কোনও খাদে শেয়াল শকুনের খাদ্য হয়ে পড়ে থাকবে ওর খুবলানো মৃতদেহ। কেউ আর শনাক্ত করতেও পারবে না।

১৩

মালা উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। এরকমটা যে হতে পারে স্বপ্নেও ভাবেনি। তার কিছুক্ষণ আগেই বস ফোন করে জানিয়েছে, রাস্তাঘাটের অবস্থা খারাপ বলে আসতে আসতে দুপুর গড়িয়ে যাবে। এই বৃষ্টিতে সারারাত হাঁটার পর মালার পা দুটোও একটু বিশ্রাম চাইছিল। ফলে ও একটু গা ছাড়া দিয়েই কাজ সারছিল। রোহিত আর সোনাম তো দিব্যি খিচুড়ি খেয়ে রেস্ট নেবে। ওরই হয়েছে যত জ্বালা। এরপর আবার দুপুরের রান্না করা, বাসন মাজা, হাবিজাবি কত কাজ। কোনোমতে খিচুড়ি নামিয়ে প্লেটে প্লেটে বেড়ে, মেঘনা আর সুদীপ্তর ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসে। তারপর রোহিত আর সোনামের খাবার নিয়ে সবে রান্নাঘর থেকে বেরোতে যাবে তখনই কথাগুলো কানে আসে। রোহিত বলছে সোনামকে,

খুব খারাপ খবর। বস করিমকে গুলি করে দিয়েছে। সব শেষ। একদম পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জে গুলি চালিয়েছে।

মানে, কী বলছিস? সোনাম উত্তেজিত।

যা বলছি, তাই। আমাকে পাঞ্জা ফোন করেছিল। বলেছে মালাকে কিছু না বলতে। করিম কালকে চিতাবাঘের ছালগুলো নিয়ে এনজেপিতে যাওয়ার পথে বিএসএফএর খপ্পরে পড়ে। বাক্সটা ওখানেই ফেলে রেখে কোনোমতে জান বাঁচিয়ে চোরাবাটো দিয়ে দৌড় মারে। তারপর বসের বাড়িতে এসে সব কথা বলতেই বস সোজা গুলি চালিয়ে দেয়।

আমরা শালা কুত্তারও অধম। এতদিন ধরে কাজ করছে করিম, ওর চেয়ে বসের কাছে লেপার্ডের চামড়াগুলোই বেশি দামি হল। আমি মাইরি বলে দিলাম, এই কেসটা মিটে গেলেই...

রোহিতের কথা শেষ না হতেই বাসন পড়ে যাওয়ার শব্দে চমকে উঠে দেখে মালা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনে ফেলেছে। তারপরই মালা সোজা খাদ লক্ষ্য করে ছুটতে থাকে, পেছন পেছন রোহিতও। কোনোমতে হাঁফাতে হাঁফাতে মালাকে ধরে ফেলে। এবার মালা ঘুরে দাঁড়িয়ে রোহিতকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। মালাকে এরকম মূর্তিতে ওরা কখনও দেখেনি। ও রোহিতকে ঝাঁকি দিতে দিতে কেবল একটাই কথা বলে, বল, যা বলছিস সব মিথ্যে, বল, বল...।

রোহিত পুরো হতভম্ব হয়ে যায়। মালাকে কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না। শেষটায় কষে একটা থাপ্পড় মারার পর মালার কান্না থেমে যায়। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে মালা।

বুকের ভেতরটা পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। শরীরের ওপর মাথা বলে আর-কিছু নেই, সব শূন্য, ফাঁপা, ফোঁপরা লাগছে। ওর তেইশ বছরের জীবনেই অনেক রূঢ় তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। কিন্তু সবকিছুর পরও যে মানুষটার কারণে আজও কতবার আত্মহত্যা করতে গিয়েও ফিরে এসেছে জীবনে, সেই যদি চলে যায়, তাহলে আর কী জন্য বেঁচে থাকা!

কত কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আজকে। টেমি চা-বাগানের ওদের ছোট কোয়ার্টারটার কথা মনে পড়ছে। ছোটোবেলার স্কুল, খেলার সঙ্গীসাথী সবার কথা মনে হচ্ছে। মালা পায়ে পায়ে এগোতে থাকে, সামনেই একটা পিচফলের গাছ, তারপরই শুরু হয়েছে খাদ। এখন আর কান্না পাচ্ছে না। মালা ধীরে ধীরে গাছটার নিচে গিয়ে বসে পড়ে। প্রচণ্ড এক আক্রোশে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করছে। মনে হচ্ছে, এই শর্মাকে খুন না করে ওর শান্তি নেই। শর্মা খারাপ লোক

এটা তো মালা জানেই, কিন্তু তাই বলে এত খারাপ! ওকে জানোয়ার বললে জানোয়ারদেরও অপমান করা হয়। ও নিজের স্বার্থে করিমকেও মেরে ফেলল! যে করিম শর্মার জন্য নিজের জান কবুল করতে সবসময় তৈরি ছিল, যে করিম ছিল শর্মার ডানহাত, তাকে ও মারতে পারল! রোহিতটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান শয়তান। ও তো সব কথা চেপে যেতে চেয়েছিল। আসলে এখানে কেউ কারোর বন্ধু নয়। সব্বাই হল শর্মার পা-চাটা কুত্তা। শর্মার আস্তানায় কুকুরের মতো জীবনের মাঝখানে করিম ছিল মালার কাছে একটা ওকগাছের মতো আশ্রয়। ওরা দুজনে কত স্বপ্ন দেখেছিল। করিম প্রায়ই বলত, আর বেশিদিন না, কিছু টাকা জমিয়ে নিই, তারপর আমি তোকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাব। অনেক দূরের কোনও শহরে গিয়ে কোনও ব্যবসাপাতি শুরু করব। আমাদেরও ঘর হবে, সংসার হবে। সারাজীবন মানুষের একরকম যায় না রে মালা।

নাহ, কিছু একটা করতেই হবে। হয় শর্মাকে খুন করে নিজেও আত্মহত্যা করবে, নইলে এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে পুলিশের কাছে সব কথা বলে দেবে। এত বছর ধরে এদের দলে থাকার কারণে ওর মতো করে শর্মার কুকীর্তির হদিশ আর কেউ জানেই না। মালা রাগে দুঃখে ক্ষোভে একটার পর একটা পাথর ছুঁড়তে থাকে, আর পাথরগুলো খাদের কোন অতলে তলিয়ে যায় আর নজর করা যায় না। মালার মনে হয় এখন এই পাথরগুলোর মতোই তার জীবনও সম্পূর্ণ অতলে তলিয়ে গেছে। আচ্ছা, পুলিশের কাছে গিয়ে বললেই পুলিশ মালার কথা বিশ্বাস করবে? শর্মার তো ওইসব দারোগা পুলিশের সঙ্গে খুব দোস্তি। সবাই জানে শর্মা একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী। তার সম্পর্কে মালার মতো তুচ্ছ একটা মেয়ের কথা ওরা বিশ্বাসই বা করবে কেন? উলটে থানা পুলিশের ঝামেলায় গিয়ে মালা আবার নতুন করে বিপদে পড়বে না তো! তা ছাড়াও ওর এই সংক্ষিপ্ত জীবনকালে যা অভিজ্ঞতা,

ও জানে মেয়েমানুষের শরীরের দিকেই সবাই আগে আগে নজর দেয়। রক্ষকই শেষে ভক্ষক হয়ে উঠবে। খবরের কাগজে টিভিতে এরকম খবর তো কত পড়েছে। আর শর্মাকে খুন করাও কী অতই সোজা! নাহ, অন্য কোনও বুদ্ধি বের করতে হবে।

সময় কোথা দিয়ে চলে যাচ্ছে, মালার কোনও হুঁশ নেই। এখন কেবল একটাই ভাবনা। বদলা! করিমের খুনের বদলা ওকে নিতেই হবে। আর তার জন্য এখান থেকে পালাতে হবে। এখান থেকে না বেরোলে কিছুই করা যাবে না। সেও নাহয় হল, কিন্তু তারপর! আচ্ছা, এই ম্যাডাম বা স্যারের সাহায্য নিলে কেমন হয়? মালা মনে মনে ভাবে, হ্যাঁ, এটাই একমাত্র রাস্তা। পুলিশ ওর কথা না শুনতেই পারে, কিন্তু এরা শিক্ষিত ভদ্রলোক, এদের কথা তো বিশ্বাস করবেই। তার ওপর যতদূর শুনেছে, এই ম্যাডাম কলকাতার একজন নামকরা আর্টিস্ট। ম্যাডামকেই গিয়ে ধরতে হবে। ধীরে ধীরে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ায়। কীভাবে যে দুপুরের জন্য আলুসেদ্ধ ভাত নামায়, সেটা কেবল ওই জানে। বুকে পাথর বেঁধে সব কাজ করতে হচ্ছে। করতে হচ্ছে নিজের স্বার্থে। নইলে ওকে দিয়ে আজকে আর কেউ কুটোটি নাড়াতে পারত না। দুটো থালায় খাবার বেড়ে আগে সুদীপ্তর ঘরে গিয়ে তালা খুলে খাবারটা রেখে দিয়েই দ্রুত হাতে তালা লাগিয়ে মেঘনার ঘরের দিকে যায়।

দিদি, ওঠো, খাবার এনেছি, থালাটা বেডসাইড টেবলে রেখে মালা বলে।

মালার মুখে এরকম কথা শুনে মেঘনা পুরো বোমকে যায়। ভাবে, আবার কী মতলব, মেরেধরে কাজ হল না বলে এখন কি মিষ্টি কথা বলে কৌশলে ওর পেট থেকে কথা বের করতে চাইছে? কিন্তু মালার মুখচোখের দিকে তাকিয়ে বোঝে, ওর আন্দাজই ঠিক। মালার কিছু একটা হয়েছে। বেশ বড়োসড় কিছু। চোখমুখ কেঁদে কেঁদে ফুলে গেছে, এখনও গালে কান্নার দাগ।

প্রথম থেকেই মালাকে দেখেছে অত্যন্ত রূঢ় স্বভাবের মেয়ে, খরখর খরখর করে কথা বলে, কথায় কথায় গায়ে হাত তোলে। সেই মালাকে আজ একদম বিধ্বস্ত দেখায়। বসে বসে নখ দিয়ে কম্বলের একটা ধার খুঁটতে খুঁটতে মালা ইতস্তত করে। মেঘনা ওর মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। মালা যেন কিছু বলতে চায়।

কিছু বলবে?

না... মানে...

আমাকে বলতে পারো।

আমি এখান থেকে পালিয়ে যেতে চাই, মালাকে কিছুটা মরিয়া দেখায়।

মানে... কী বলতে চাইছ? এর অর্থ তুমি জান? ধরা পড়লে এরা কুকুরের মতো গুলি করে মারবে। আর আমাকে বিশ্বাস করে এত কথা বলছ, ব্যাপারটা কী? মেঘনার এবার একটু খটকা লাগে। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

আসলে তোমাকে দেখে মনে হল, তোমাকে ভরসা করা যায়। এর আগেও তো এরা কত কত মেয়েকে ধরে এনেছে, ওরা সব গাঁওয়ার, আনপড়, সবকটা ভয়ে জুজু হয়ে থাকত, আর তুমি কেমন এদের মুখে মুখে কথা বলছ! মানতেই হবে তোমার বুকের পাটা আছে। তোমাকে দেখলেই বোঝা যায় তুমি শিক্ষিত, ভদ্রঘরের মেয়ে। তাই এত কথা বলছি। আমার জীবন তো তুমি জানো না। আমি কি আর বেঁচে আছি দিদি, সব কথা শুনলে তুমিও বলবে মালা কবেই মরে গেছে। ভয় পেয়ো না, পালালে আমি একা পালাব না, তোমাকে নিয়েই পালাব। তুমি জানো না এরা কত বড়ো শয়তান। তুমি যেই ওদের ওই ছবিগুলোর সন্ধান দিয়ে দেবে...

মেঘনা মালাকে কথা শেষ করতে দেয় না, দ্যাখো মালা, তোমরা প্রথম থেকেই একটা ভুল করছ। আমি পটগুলোর ব্যাপারে কিছুই জানি না। অথচ তোমরা এর জন্য আমাকে সমানে টর্চার করে চলেছ।

তোমাকে যেরকম ভেবেছিলাম, তুমি তো তত ভোলাভালা না। আমি নিশ্চিন্তে তোমাকে এত বড়ো একটা কথা বলে ফেললাম, আর তুমি আমাকেও বিশ্বাস করছ না! আসলে তুমি বুঝতেই পারছ না তোমাকে নিয়ে ওরা কী করবে। এরা মেয়েদের সহজে প্রাণে মারে না।

প্রাণে মারে না মানে?

বুঝলে না, কী করে! এই যে আজকাল টিভিতে খবরের কাগজে এত দেখ, তাও বোঝ না! এরা মেয়েদের নিয়ে ব্যবসা করে। সোজা কথায় মেয়ে পাচার করে। আমাকেও কোনোদিন আবারও বিক্রি করে দেবে।

আবারও বিক্রি করে দেবে মানে...

মানে আর কিছুই না, আমাকে তো শর্মা নোরবুস্যারের কাছ থেকে কিনেছে।

শর্মার ব্যাপার তো বুঝলাম। নোরবুও লোক ভালো না সেটাও জানি, কিন্তু ও তো একজন পলিটিকাল লিডার, সেও এইসব চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত? মেঘনা জানতে চায়।

শর্মা এই দলের মাথা। স্মাগলিং, মেয়ে পাচার, ড্রাগ চালান হেন কাজ নেই যা শর্মা করে না। আর নোরবু হল শর্মারও বাপ। একে তো রুলিং পার্টির লিডার বলে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে, তার সঙ্গে জুটেছে এই রোহিত আর সোনাম। এ দুটো শর্মার একনম্বর চামচা। একদম হাড়বজ্জাত। আমার কথা মন দিয়ে শোনো, আমি তক্কে তক্কে থাকব, রাতে আমি আজকে ওদের মদের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে দেব, যাতে মড়ার মতো ঘুমায়, সেই ফাঁকে আমরা পালাব। আমি আর পারছি না। এখানে থাকলে এরা আমাকে বিদেশে পাচার করে দেবে। কতদিন ভেবেছি সুইসাইড করি, কিন্তু মরা খুব সহজ, আর আমি মরে গেলে এদের বিশেষ কিছু ক্ষতিও হবে না। শর্মার কাছে আমি তো লাখ দুলাখ টাকার চাইতে বেশি কিছু না। আমি শোধ নিতে চাই। সেটা এখানে থেকে সম্ভব না। অনেকদিন এদের সঙ্গে

আছি, ওদের গোপন আস্তানা, কাজকর্মের খবরাখবর আমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না।

তা এতদিন বাদে হঠাৎ আজকেই তোমার এরকম মনে হওয়ার কারণ?

অনেক সহ্য করেছি। কিন্তু আর পারছি না। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, আমার আর কোনও উপায় নেই। এই শিয়াল কুকুরের মতো জীবন নিয়ে এখন বাঁচা মরা দুইই আমার কাছে সমান। রাগে উত্তেজনায় মালার মুখচোখ পুরো লাল।

সবকিছু খুলে বলো তো মালা।

আমার বাড়ি ছিল টেমি চা-বাগানে। বাবা ছিল বাগানে কুলিদের সর্দার। আমার যখন আট ন-বছর বয়েস, আমার মা মাত্র ক-দিনের জ্বরে মারা গেল। আমাদের সংসারটাই তারপর থেকে বদলে গেল। মা চলে যাওয়ার পর থেকে বাবা আস্তে আস্তে মদের নেশা বাড়িয়ে দিল। আর এই নেশাই বাবাকে খেল। একদিন, তখন আমার চোদ্দ পনেরো বছর হবে, নোরবু তখন সিকিমের ট্রেড ইউনিয়নের একজন বড়ো নেতা, বাগানে মিটিং করতে এসে আমাকে দেখে। তারপর থেকেই বাবার পিছনে লেগে যায়, বলে ওর ভাতিজার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে। বাবা তখন নেশার ঘোরে আর মানুষ ছিল না, নইলে বুঝতে পারত অত বড়োলোকের বাড়িতে আমাদের মতো কুলিমজুর ঘরের মেয়েদের বিয়ে কখনই সম্ভব না। গ্যাংটকে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেওয়ার নাম করে নোরবু আমাকে আর বাবাকে নিয়ে রওনা দেয়। পথে গাড়ির মধ্যেই মদের বোতল খুলে খাওয়া শুরু হল। বাবা তো বোতল পেলে আর কিছুই চিনত না, আমার ব্যাপারেও হুঁশ থাকত না। মাঝরাস্তায় নোরবু বাবাকে নিয়ে নেমে গেল। আমার তাতেই ভীষণ খটকা লাগে। আমি বারবার জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছে, কী ব্যাপার, কিন্তু আমাকেও ভুজুং-ভাজুং দিয়ে বুঝিয়ে ওরা নেমে গেল। তারপর থেকে বাবাকে আর কোনোদিন দেখিনি, আদৌ বেঁচে আছে কিনা, সেটাও

পর্যন্ত জানি না। মালা হাতের উলটোপিঠ দিয়ে চোখের জল মোছে।

তারপর? মেঘনা জিজ্ঞেস করে।

তারপর আর কী, আর কোনোদিন আমাদের ওই সুন্দর চা-বাগানে যাইনি। নোরবুর গাড়িতে একটা লোক বসে ছিল, শ্যাম নাম লোকটার। ওই আমাকে গ্যাংটকে একটা বাড়িতে নিয়ে তোলে। প্রথম দুদিন কিচ্ছু খেতে না দিয়ে তালা বন্ধ করে রেখে দিয়েছিল। ততদিনে আমি বুঝে গিয়েছি বিয়ে টিয়ে সব ভাঁওতা, নোরবু আমার বাবাকে ডাহা মিথ্যে কথা বলেছে। আমি তখন বিশ বাঁও জলে। একদিকে বাগানের মেয়ে, শহরের হালচাল কিছুই বুঝি না, তার ওপর এইসব বদমাশ লোকেদের পাল্লায় পড়েছি। অনেক কাকুতি মিনতি করেছিলাম ছেড়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু ওরা তো আর ছেড়ে দেওয়ার জন্য ধরে আনেনি। দুদিন বাদে নোরবু এল আর শুরু হল আমার ওপর অত্যাচার। দিনের পর দিন আমাকে রেপ করেছে এই নোরবু। জোর করে কাপড় জামা খুলিয়ে আমার ছবি তুলেছে, আর ভয় দেখাত পালানোর চেষ্টা করলেই এই ছবি ইউটিউবে ছেড়ে দেবে। শুধু নোরবু না, ওর ওপরের লেভেলের নেতাদের কাছেও আমাকে একেক দিন করে ভেট দিয়েছে। এই যে বাংলোটায় এখন আমরা আছি, এটাই হল শর্মার গোপন ফুর্তির ঠেক। এই বাড়িতেই কতদিন কত লোকের সঙ্গে আমাকে রাত কাটাতে হয়েছে। আমার তখন কতই বা বয়েস বলো, আমার না খুব ব্যথা লাগত। খুব কষ্ট হত। এমনও দিন গেছে, এত লোক এসেছে আমার কাছে যে রাতে ব্যথায় কেঁদেছি, ঘুমোতে পারিনি। ওদের সঙ্গে শুতে রাজি না হলেই আমাকে বেধড়ক মার মারতো। সারা গায়ে সিগারেটের ছেঁকা দিয়ে দিয়ে ঘা করে দিয়েছিল। তুমি দেখবে আমার গায়ে কত মারের দাগ?

এক টানে মালা ওর সোয়েটার খুলে ফেলে, টপটা খুলে ফেলে আর বিস্মিত হতচকিত মেঘনা দেখে

মালার শ্বেতমর্মরের মতো শরীরে কত আঘাতের দাগ। মেঘনার অসহায় লাগে। ও মালার পিঠে হাত রাখে। এতদিন পর সহানুভূতির ছোঁয়া পেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে এই ডাকাবুকো মেয়েটা। কাঁদতে কাঁদতেই বলে, জানো এত কিছুর পরও আমি মুখ বুজে থাকতাম শুধু করিমের কথা ভেবে। এখানে আসার কিছুদিন পর করিমের সঙ্গে আমার ভাব হয়, আমরা ভেবেছিলাম বিয়ে করে সংসার পাতব। আর কালকে রাতে শর্মা করিমকেই গুলি করে মেরে ফেলেছে। আমি কিছুতেই ছাড়ব না ওকে। যতদিন না আমি এর বদলা নিতে পারছি, আমার করিমের আত্মা শান্তি পাবে না। মালা এবার বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে হাউহাউ করে কাঁদতে থাকে।

ও তাহলে এই কেস! এইজন্যই মালা তখন ওরকম পাগলের মতো কান্নাকাটি করছিল, মেঘনা মনে মনে ভাবে, ও যদি সত্যিই পালিয়ে যেতে সাহায্য করে, দেখা যাক। তারপরই মনে হয় মানুষ আদতে নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। ও, মালা প্রত্যেকেই। নিজের হিসেবের খাতায় টান না পড়লে কেউ কারোর জন্য এক সুতো জায়গাও ছাড়তে চায় না। কিন্তু মালাকে এভাবে কাঁদতে দেখে ও চিন্তায় পড়ে যায়, ওই শয়তানগুলোর কানে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

চুপ... চুপ... এই মেয়ে, এভাবে কাঁদে না, আমি আছি তো, আরে চুপ করো, ওরা শুনে ফেললে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। মেঘনা মালার দিকে জলের বোতলটা এগিয়ে দেয়।

জল খেয়ে একটু সুস্থিত হয়ে মালা আবার বলে, তারপর নোরবু আমাকে শর্মার কাছে বিক্রি করে দেয়। শর্মাও বিক্রি করে দিত, শুধু দেয় না কারণ ওর প্রচুর সাহেব ক্লায়েন্ট আছে, আর আমি ক্লাস এইট অব্দি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছি বলে ওরা আমার সঙ্গে কথা বলে খুশি হয়, নইলে শুধু বিছানায় যাওয়ার জন্য তো কত মেয়ে পাওয়া যায়। আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব,

মালা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ে, আমি পাহাড়ের মেয়ে, আমাদের জেদ তুমি জানো না।

কিন্তু এভাবে পালিয়ে গেলে এই চক্রটাকে ধরবে কে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই লোকবাহাদুর পুলিশে খবর দিয়ে দিয়েছে। তুমি একটা কাজ করো, আমার মোবাইলটা যে করেই হোক এদের থেকে উদ্ধার করো। এদের শাস্তির ব্যবস্থা না করে আমি অত সহজে পালাচ্ছি না।

দেখছি দিদি। কথাটা যে আমার মাথাতেও আসেনি তাও নয়, কিন্তু মোবাইলটা কোথায় রেখেছে, আমাকেও বলেনি। আসলে এই রোহিত ছেলেটা হল সবচেয়ে বদমাশ। ওর থেকে কোনও কথা বের করা আর অজগরের মুখ থেকে শিকার টেনে বের করা একই জিনিস।

আচ্ছা মালা, তোমার নিজস্ব মোবাইল নেই?

আমাকে মোবাইল দিলে যে ওদের হালত খারাপ হয়ে যাবে, ওরা নিজেরাই জানে সে কথা। তার ওপর সবসময় ভয় পায় আমি যদি পালিয়ে যাই, যদি ওদের সব কথা ফাঁস করে দিই। আমাকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখে। আমি পালিয়ে গেলে তো শুধু শর্মা নয়, নোরবুর মুখোশও খুলে যাবে। তোমাকে তো বললাম, আজকের রাত অব্দি একটু সামলে সুমলে চলো, তারপর কিছু একটা ব্যবস্থা আমি করবই।

এখানে তো চৌকিদারও আছে, এত লোকের মাঝখান থেকে কী করে পালাবে?

তুমি এই দলের লোকেদের জান না। এরা রাত্তির হলে নেশা করবেই, সে তোমার শর্মাই হোক আর নোরবুই হোক, রোহিত সোনাম এরা তো কোন ছাড়। তবে এরা বড্ড সেয়ানা, মদ খেয়েও তালে ঠিক থাকে। কিন্তু, আমি তোমাকে বলে দিলাম, মহাকালজীর কসম, আমি পাহাড়ের মেয়ে, আমরা অনেক জড়িবুটি জানি। ওদের মদের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে আর দেখতে হবে না, ওদের ঘুম ভাঙতে ভাঙতে সেই বিকেল। আচ্ছা, আর কথা নয়, তোমাকে যা বললাম মনে

থাকে যেন। তুমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, শর্মার আসার সময় হয়ে এল বলে। আর-একটা কথা মনে রাখবে, ছলে বলে কৌশলে যে করে হোক শর্মাকে আজকের দিনটা সামলে রাখতে হবে। যাই হোক না কেন, তুমি কিছুতেই পটগুলোর সন্ধান দেবে না, দিলেই কিন্তু সব শেষ।

মালাকে কি এতটা বিশ্বাস করা যায়? কিন্তু এতটাও কেউ বানিয়ে বলতে পারে? আর ওই দাগগুলো? আর আজ সকালে যে ওকে ওইভাবে কান্নাকাটি করতে দেখল, সবই কি মিথ্যে! আপাতত মালার কথা বিশ্বাস করবে, এটাই স্থির করল মেঘনা। ওর জীবন এখন একটা ভঙ্গুর সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে আছে, এ অবস্থায় বিশ্বাস করে ঠকাও ভালো। তা ছাড়াও এখন যা অবস্থা, তার চাইতে খারাপ আর কী হতে পারে!

চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে কোনোমতে একটা হাতখোঁপা করে নেয় মেঘনা। ও টের পায় শর্মার নাম শুনেই ভেতরে ভেতরে একটা কাঁপুনি শুরু হয়েছে। মালা যতই ভুলিয়েভালিয়ে রাখার কথা বলুক, শর্মা কি দুধের খোকা, ওর মতো ঘাগু মানুষকে ভুলিয়ে রাখা চাট্টিখানি কথা! নিজেকে যেন যুদ্ধক্ষেত্রের এক আহত সৈনিক বলে মনে হয়। তারপর নিজেই নিজেকে সাহস দেয়, আগের থেকেই হেরে বসে থাকলে চলবে? তুমি তো একা একাই জীবনের এতটা পথ চললে। যেন মেঘনার তৈরি হওয়ার জন্যই অপেক্ষা করে ছিল শর্মার গাড়ি। ওর জুতোর ফিতে বাঁধা শেষ হয়েছে কি হয়নি বাইরে গর্জন করে উঠল জিপের আওয়াজ।

১৪

স্যার এরিয়াটা মানখিম থেকে জুলুক যাওয়ার রাস্তায়, লোকবাহাদুর বলে।

হুঁ, তমাল মোবাইলে কাকে যেন নির্দেশ দেয়, আপনারা একটা বড়ো ফোর্স ইমিডিয়েটলি আরিতার পিসিতে পাঠান। আমি এনকয়ারি করে যা খবর পেয়েছি পার্টি খুব ডেঞ্জারাস। তার মধ্যে ওরা একজন ভদ্রমহিলাকে কিডন্যাপ করে রেখেছে। যদি ওঁকে গানপয়েন্টে রেখে পালিয়ে যায় আমাদের কিছুই করার থাকবে না। সবকটা নামকরা ক্রিমিনাল। বর্ডার সামনেই। ওদের কাছে সেরকম পাওয়ারফুল আর্মস থাকলে এই ছোট্ট ফোর্স নিয়ে আমি কী করতে পারব!

ফোনের ওপাশের কথা লোকবাহাদুর কিছু বুঝতে পারে না, শুধু শুনতে পায় তমাল বলছে, ওকে স্যার, আপনি ফোর্স পাঠান, আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের এদিক দিয়ে যেতে যা টাইম লাগবে গ্যাংটক থেকে আসতেও সেই একই লাগবে। ল্যান্ডস্লাইড হয়ে এদিকের রাস্তার যা হাল হয়েছে, যেতে যেতে অন্তত ঘণ্টা দুয়েক তো লাগবেই। আপনাদের তো স্মুদ রাস্তা।

এতক্ষণে লোকবাহাদুর বোঝে যে গ্যাংটক থেকে আরও পুলিশ আনানোর ব্যবস্থা হচ্ছে।

ঘড়ির কাঁটা চারটে ছুঁইছুঁই। রাস্তায় আলো বলতে সামান্য কটা স্ট্রিট লাইট। দিনের আলো ফুটতে এখনও ঢের দেরি। এদিকে তমালের আর তর সইছে না। তড়িঘড়ি গুরুংকে ফোন লাগায়,

মিস্টার গুরুং, আপনি দুটো অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট রেডি করে ফেলুন শর্মা আর মিস্টার নোরবুর নামে। ওদের পুরো নামধাম জানেন তো?

কেলো করেছে, গুরুং বলে, নোরবু স্যারের নামে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট! আমার ঘাড়ে কটা মাথা আছে! স্যার বুড়ো বয়েসে চাকরি নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে যাবে। ছেলেপুলে নিয়ে পথে বসে যাব। আপনারও সর্বনাশ করে দেবে, আপনি আমার বস হতে পারেন, কিন্তু এই চাকরিতে আমি আপনার চেয়ে অনেক বেশিদিন আছি। এইসব নেতাদের হাড়েহাড়ে চিনি, স্বার্থে ঘা লাগলে এরা সব এক একটা ক্ষ্যাপা কুত্তার মতো হয়ে যায়।

ইটস মাই অর্ডার মিস্টার গুরুং। আর আপনি তো সিগনেচার করছেন না, আপনার ভয় কীসের? যা বোঝার আমি বুঝে নেব। আপনি পেপার রেডি করুন। হাতে একদম সময় নেই।

স্যার, আপনি বুঝতে পারছেন না। হেন কাজ নেই যা ওরা করতে পারে না, গুরুংএর গলা কাঁপতে থাকে, ট্রান্সফার তো অনেক খুচরো ব্যাপার, মার্ডারও করে দিতেও এরা দুবারও ভাববে না। আপনাকে ভালো কথা বলছি, ওদের দলের ছুটকো ছাটকা ক্রিমিনালগুলোকে অ্যারেস্ট করে কেস দিয়ে দিন। ভুলেও এসব রাঘববোয়ালদের দিকে হাত বাড়াবেন না। প্রেস আর পাবলিককে আমি সামলে নেব।

হাউ ডেয়ার ইউ! তমালের গলার স্বর চড়তে থাকে। আমি আপনার বস না আপনি আমার! জাস্ট ক্যারি অন মাই অর্ডার।

তমালের এই চেহারার সঙ্গে ওর ড্রাইভার পরিচিত। ও গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু যত স্পিডেই যাক না কেন, এই ভাঙাচোরা রাস্তা, তার ওপর কাল সারারাত বৃষ্টি হয়েছে, কুড়ি পঁচিশের বেশি এগোয় না স্পিডোমিটারের কাঁটা। ধীরে ধীরে দিনের আলো ফুটে ওঠে। তমালের টেনশনও উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। এধরনের এনকাউন্টারের পক্ষে রাতের বেলাই

বেশি সুবিধেজনক, রাতে পাহাড়ি রাস্তায় বিরোধীপক্ষ সহজে বেশিদূর পালিয়ে যতে পারে না, তা ছাড়া পুলিশের কাছে স্পটলাইট ইত্যাদি থাকায় ওরা অনেক বেশি সুবিধেজনক অবস্থায় থাকে।

আরিতার আসতে আর মিনিট কুড়ি বাকি, এই সময় তমালের মোবাইল বেজে ওঠে— গুরুং কলিং।

স্যার, খুব ফেঁসে গেছি। সিকিম জনতা সংঘের লোকেরা থানা ঘেরাও করেছে। বলছে লামার খুনিদের আজকের মধ্যে অ্যারেস্ট না করতে পারলে ওরা থানার সামনে হাঙ্গার স্ট্রাইক করবে। ওরা এটাকে একটা রিলিজিয়াস ইস্যু বানিয়ে গোলমাল করতে চাইছে।

সিকিম জনতা সংঘ মানে তো মিস্টার নোরবুর পার্টি। তার মানে ওরা প্ল্যানড ওয়েতে এগোচ্ছে। ওরা ঠিক খবর পেয়ে গেছে আমরা এখন এনকাউন্টারে বেরোব, এখন যদি আমাদের দেরি করিয়ে দিতে পারে তাহলে ওদের প্রিপারেশন নিতে সুবিধে হবে। হাউ স্ট্রেঞ্জ, আমি কিছুক্ষণ আগেই আপনাকে বললাম অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টের কথা, আর ওরা এর মধ্যেই কী করে খবর পেয়ে গেল! তার মানে থানাতেই এমন কেউ আছে, যে ওদের সব খবরাখবর দিচ্ছে। আপনি সেই কালপ্রিটকে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করুন। আর হ্যাঁ, খুব ট্যাক্টফুলি কথা বলবেন, কোনোরকম তর্ক বিতর্কে যাবেন না, আমি আসছি। ডোন্ট ওরি। সব ম্যানেজ হয়ে যাবে।

কিন্তু তমাল যতটা সহজে সব মিটিয়ে ফেলবে ভেবেছিল সেরকমটা হল না। আরিতার পুলিশ-চৌকির সামনে পৌঁছোতেই প্রায় তিন চারশ লোক ওর গাড়ি ঘিরে ফেলে শ্লোগান দিতে শুরু করে। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো সেই সঙ্গে প্রেসের লোকেরাও ক্যামেরা ইত্যাদি নিয়ে হাজির। কিন্তু এসব পরিস্থিতির মোকাবিলার ব্যাপারে ওদের ট্রেনিংয়ের সময় থেকেই খুব ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। তা ছাড়া চাকরিও তো বেশ ক বছর হল, তমাল বুঝতে পারে এরা

কেউ-ই ভেতরের খবর জানে না। এ কেবল ওদের দেরি করিয়ে দেওয়ার জন্য নোরবুর কৌশল। এখন কোনও সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার ক্ষেত্রে জনতাই সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র, নোরবুর মতো পোড়খাওয়া নেতা সেটা খুব ভালোমতোই জানে। এদের আদ্দেকই হল হুজুগের পাবলিক। সুতরাং খুব সাবধানে এদের মোকাবিলা করতে হবে। এই সময় গুরুং তৎপর হয়ে এগিয়ে আসে, ওর হাতে বিশাল চোঙাওয়ালা মাইক্রোফোন। ও ঘোষণা করে দেয় যে তমাল সরাসরি ওদের নেতাদের সঙ্গে কথা বলবে। তারপর এসে তমালের হাতে সেই মাইক্রোফোন ধরিয়ে দেয়। তমাল ছোটখাটো একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেলে, যেন সে ওদেরই লোক—

আমার প্রিয় সিকিমবাসী ভাইবোনেরা, আজ আমরা এখানে জড়ো হয়েছি আমাদের মঠের আচার্যের হত্যাকারীর শাস্তির জন্য। আপনারাও যেমন চান এই জঘন্য অপরাধীদের চরম শাস্তি হোক, আমিও তেমন চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই নৃশংস হত্যাকারীদের গ্রেফতার করে মহামান্য আদালতের কাছে শাস্তির জন্য পেশ করতে। এর জন্য আপনাদের সহযোগিতার প্রয়োজন, আপনাদের সাহায্য ছাড়া আমি বা পুলিশবাহিনী কেউই কিছু করতে পারবে না। আমরা আচার্যর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পেয়ে গেছি। তাঁকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। সিকিমের মতো শান্তিপূর্ণ রাজ্যে এই ঘটনা ইতিহাসে প্রথম। কিন্তু হত্যাকারীদের ধরতে গেলে আমাদের এই মুহূর্তে থানায় বসে থাকলে চলবে না। আমি গ্যাংটক থেকে বিশাল পুলিশ ফোর্স পাঠানোর আর্জি জানিয়েছি, তারাও এসেই পড়ল বলে। তারা এসে গেলেই আমাদের অভিযানে বেরিয়ে পড়তে হবে। রাজ্যের যে কোনও কোনাতেই লুকিয়ে বসে থাকুক না কেন লামাজির খুনিরা, আমি সকলের সামনে কথা দিচ্ছি, তাদের খুঁজে বের করবই। আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, এই সময় থানা অবরোধ

করে আমাদের কাজের দেরি করিয়ে দেবেন না, বরং কারোর কিছু নতুন তথ্য জানা থাকলে সেগুলো আমাদের জানিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন।

তমালের বক্তৃতার পর জনগণের মধ্যে একটা গুঞ্জন তৈরি হয়। ইতিমধ্যে গ্যাংটক থেকে দুটো বড়ো বড়ো ভ্যানভর্তি পুলিশফোর্স এসে গিয়েছে। তমালের কথাবার্তার প্রতিক্রিয়াতেই হোক বা একসঙ্গে এত পুলিশ দেখে ভয় পেয়েই হোক ওদের মধ্যেও একটা মতভেদ সৃষ্টি হয়। আসলে স্বাভাবিকভাবেই নোরবুর খাস লোক এই ভিড়ের মধ্যে খুবই কম। বেশিরভাগই আমজনতা। নিজের ভালো পাগলেও বোঝে। তারা তমালের কথার সারমর্ম বুঝে ভিড় পাতলা করতে শুরু করে। নিজের ডিপ্লোমেসিতে তমাল নিজেই বেশ আত্মপ্রসাদ বোধ করে। কিন্তু ততক্ষণে প্রচুর সময় নষ্ট হয়ে গেছে, নোরবু ঠিক সুযোগ বুঝে নিজের অবস্থা গুছিয়ে নিয়েছে, তমাল মনে মনে ভাবে।

মিস্টার গুরুং, কুইক, আর সময় দেওয়া যাবে না। চলুন...

স্যার এই সইসাবুদগুলো...

হ্যাঁ, যেতে যেতে রাস্তায় সব করে নিচ্ছি। আপনি আমার গাড়িতে চলে আসুন।

পরপর পুলিশের গাড়ি একটা বিশাল কনভয়ের মতো চলতে শুরু করে। সবার আগে তমালের গাড়ি, সেই গাড়িতে লোকবাহাদুর বসে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। জায়গায় জায়গায় ধস নেমে পথঘাট বলে আর কিছু নেই। অনেক ঘুরপথে যেতে হচ্ছে।

মাত্র কুড়ি পঁচিশ কিলোমিটার, কিন্তু কালকের বৃষ্টিটাই সব গন্ডগোল করে দিল, লোকবাহাদুর বলে, নইলে আমরা এক ঘণ্টায় পৌঁছে যেতাম।

তমাল বারবার ঘড়ি দেখে, মেঘনার জন্য ওর বিশেষ করে চিন্তা হচ্ছে। শর্মা যদি পুলিশ আসার খবর পেয়ে ওর কোনও ক্ষতি করে দেয়! এইসব স্মাগলাররা সবই পারে। রেপ মার্ডার, এসব ওদের

কাছে জলভাত। তমাল ড্রাইভারকে তাগাদা দিতে থাকে। টেনশনে দম বন্ধ হয়ে আসছে। বাই হুক অর ক্রুক মেঘনাকে ওদের খপ্পর থেকে বের করে আনতেই হবে। অপেক্ষার যেন আর শেষ নেই। তমাল আবার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের তালুতে ঘুসি মারে।

সব অপেক্ষারই শেষ আছে, একসময় সেই বার্চ গাছের জঙ্গলের কাছাকাছি পৌঁছে যায় গাড়িগুলো। লোকবাহাদুর উত্তেজিত,

স্যার, এই জঙ্গলটার ওপাশেই সেই ঘরটা, ওখানেই আমাদের রেখেছিল।

তমাল হাতের ইশারায় সবকটা গাড়িকে থামতে বলে। তারপর সকলে যার যার মতো পজিশন নিয়ে নেয়। এ ধরনের এনকাউন্টারে সাধারণত সবাই সার দিয়ে একসঙ্গে গিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে। তমালও সেইমতোই নির্দেশ দেয়। বার্চ গাছের জঙ্গলটা বেশ উঁচুতে। পুরো দলটা গুঁড়ি মেরে এগোতে থাকে, সবার হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র। এক পা এক পা করে যেতে যেতে একসময় চাতালটায় গিয়ে পৌঁছায়। কিন্তু অকুস্থলে পৌঁছনোর পর ওরা হতবাক হয়ে যায়, চাতাল বলে আর-কিছুই অবশিষ্ট নেই। এক টুকরো জমি শুধু ঝুলে আছে, পাঁঠা খাসির গায়ের থেকে প্রায় সবটা মাংস কেটে নেওয়ার পর যেমন দড়ি থেকে ছোট্ট একটা খণ্ড ঝুলে থাকে, ঠিক তেমনই পাহাড়ের গায়ে চাতালের একটা টুকরো লেগে আছে, বাকিটা তলিয়ে গেছে ধসে। কোথায় ঘর, কোথায়ই বা ওদের গাড়ি!

পালিয়েছে! লোকবাহাদুর চিৎকার করে ওঠে।

তমালকে পুরো হতাশ ভেঙে পড়া মানুষের মতো দেখায়। ক্রিমিনালগুলো শেষ অব্দি এভাবে চোখে ধুলো দিয়ে মেঘনাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। পরমুহূর্তেই সংবিৎ ফিরে আসে। স্নিফার ডগ আছে কী করতে?

মিস্টার গুরুং কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিতে বলুন, কুইক। ওরা পালালেও খুব বেশি দূরে চলে

যেতে পারেনি। সারারাত বৃষ্টি ছিল, তার ওপর এই ল্যান্ডস্লাইড। কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিতেই ওরা ঘেউঘেউ করতে করতে ধসে ভেঙে পড়া মাটির একপাশ দিয়ে একটা সরু একজন মানুষের চলার মতো পথ ধরে ছুটতে থাকে। পেছন পেছন ওদের অনুসরণ করে পুলিশবাহিনী। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর কুকুরগুলো একটা ছোট নদীর কাছে এসে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ডাকতে থাকে আর বাতাসে কিছু শোঁকার চেষ্টা করে।

ঠিক এই সময় তমালের ওয়াকিটকিতে কল আসে, গ্যাংটক পুলিশ স্টেশন থেকে কল করেছে,

হ্যালো, মিস্টার রয়, ওই ভদ্রমহিলার মোবাইল এইমাত্র অন হয়েছে। আমরা লোকেশন ট্রেস করে ফেলেছি। আপনাকে পাঠাচ্ছি।

তমালের মনে যেন হঠাৎ এক ঝলক খুশির হাওয়া বয়ে যায়। আচমকাই চলার গতিবেগ বেড়ে গেল। উৎসাহ এমনই এক অনুভূতি, যা সহজেই অন্যদের মধ্যেও চারিয়ে যায়। আর ওরা তো দলবদ্ধ হয়ে অ্যাকশনে বেরিয়েছে। এই খবর পাওয়ার পর সকলেই প্রায় এক দৌড়ে সম্পূর্ণ পথ অতিক্রম করতে চায়। কিন্তু পথ এত দুর্গম যে মাঝে মাঝেই খুব সন্তর্পণে প্রায় পা টিপে টিপে যেতে হচ্ছে। ঘন্টাটাক এভাবে চলার পর তমালের মোবাইলের জিপিএসে দেখায় লোকেশেনে এসে গেছে। সামনেই একটা বাংলোবাড়ি।

১৫

মেঘনার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা শিরশিরে অনুভূতি নেমে আসে। সমস্ত শরীর যেন ছেড়ে দিচ্ছে। দু-হাতের তালু নিয়ে ঘষতে ঘষতে নিজেই নিজেকে সাহস দেয়। ও জানে, আজ এসপার নয় ওসপার, কিছু একটা হবেই। শর্মার ভারী বুটের আওয়াজ ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে, নিজের হৃৎপিণ্ডেরর ধকধকানি নিজেই শুনতে পায় মেঘনা। দড়াম করে দরজা খুলে শর্মা ঘরে ঢোকে,

কী ম্যাডাম, কী ঠিক করলেন?

ঠিক করার আবার কী আছে, যে কথা আমি নিজেই জানি না, সেটা কী করে বলব!

অনেকক্ষণ ভদ্রতা করেছি। ঢ্যামনামি হচ্ছে, জানি না! জানি না বললেই আমি মানব, আমাকে এত বোকা ভাবিস! তাহলে তুই ওইদিন রাত্তিরে লামার সঙ্গে পিরিত মারাতে গিয়েছিলি! ইউ ডার্টি বিচ, শর্মা এগিয়ে এসে মেঘনার চুলের মুঠি এত শক্ত করে ধরে যে মেঘনা আর ঘাড় নাড়াতে পারে না। সেই অবস্থাতেও হাত পা চালিয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু শর্মার সঙ্গে এঁটে ওঠা যে ওর কর্ম নয়, কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পেরে যায়। শর্মা এবার ওর জ্যাকেটের চেন ধরে টান দেয়, মেঘনা চিৎকার করে ওঠে, ছাড়ো বলছি, পুলিশ কিন্তু সব জানে, তোমাকে একবার ধরলে এ জীবনে আর ছাড়া পেতে হবে না, ছাড়ো, ছেড়ে দাও। এতক্ষণে লোকবাহাদুর পুলিশের কাছে পৌঁছে গেছে। তোমাদের সবকটাকে জেলের

ঘানি না টানিয়ে আমিও ছাড়ব না, মেঘনা প্রাণপণে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু একে তো শর্মার গায়ের জোর অনেক বেশি, তার ওপর ও আজকে একদম মরিয়া, যে করেই হোক মেঘনার পেট থেকে সব কথা বের করবে।

একটানে ওর জ্যাকেট খুলে ফেলে ঝপ করে শর্মা ওর টিশার্টের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দেয়। যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে মেঘনা, তারপর আচমকাই হাঁটু দিয়ে শর্মার দুই উরুর মাঝখানে প্রাণপণে আঘাত করে। শর্মা, হায় রাম, মার ডালা রে, বলে মেঘনাকে ছেড়ে দিয়ে মেঝের ওপর পড়ে কাতরাতে কাতরাতেই রোহিতকে বলে, আবে, খাড়া হো হোকে মজাক দেখ রাহা হ্যায় কেয়া? মার শালিকে, আজ ওকে এমন মজা চাখাব, যেন জিন্দেগিতে ভুলতে না পারে। রোহিত আর সোনাম সত্যিই এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল, শর্মার এই হাল দেখে, এবার ওরাও সক্রিয় হয়ে ওঠে। রোহিত প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মেঘনার হাতটা মুচড়ে দেয়, মেঘনা কঁকিয়ে উঠতে না উঠতেই জোরসে পরপর ঘুসি মারতে থাকে ওর পেটে। যন্ত্রণায় দম বন্ধ হয়ে আসছে। ও পেট চেপে ধরে বসে পড়ে। মুখ দিয়ে হঠাৎই এক ঝলক রক্ত উঠে আসে। মালা এতক্ষণ দরজার কাছে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে, যেন কথা বলতেও ভুলে গেছে, ঘটনার আকস্মিকতায় সেও পুরো ভেবলে গেছে। সোনাম একটা দড়ি দিয়ে মেঘনাকে পিছমোড়া করে বাঁধতে শুরু করে। ঠিক এই সময়েই বাইরে একসঙ্গে অনেকগুলো কুকুরের ডাক, গাড়ির আওয়াজ। শর্মা চিৎকার করে ওঠে,

পুলিশ! ভাগো ইঁহাসে, জলদি...

কিন্তু ভাগবে কী করে, ততক্ষণে পুলিশ চারিদিক থেকে বাড়িটাকে ঘিরে ফেলেছে। একসঙ্গে দুপদাপ শব্দ তুলে অনেকগুলো মানুষ ঘরে ঢুকে যায়। তমাল ওর রিভলবারটা দিয়ে শূন্যে একবার ফায়ার করে বলে,

কেউ পালানোর চেষ্টা করবে না, এক পা এদিক ওদিক করেছ কী গুলি করে দেব। মিস্টার গুরুং, সবকটাকে বেঁধে ভ্যানে তুলুন।

শর্মা এর মধ্যেও মেজাজ দেখিয়ে বলে, আমাকে অ্যারেস্ট করছেন, ওয়ারেন্ট আছে?

মিস্টার গুরুং, তমাল বলে, ওঁকে ওয়ারেন্টটা দেখিয়ে দিন। এরা সব সমাজের সম্মানিত মানুষ, ওয়ারেন্ট না দেখিয়ে কি এদের ধরা যায়!

আমিও দেখে নেব, টাকার আমার অভাব নেই। দেখিয়ে দেব কত ধানে কত চাল। আপনাকে যদি না ট্রান্সফার করিয়েছি তো আমার নামও শর্মা না। আর এই গুরুংকে তো আমি শেষ করে ছাড়ব। মাসে মাসে টাকা খাওয়ার বেলায় আছে, আর কাজের বেলায় যত বেইমানি, শর্মা আক্রোশে ফুঁসতে ফুঁসতে বলে।

হ্যাঁ, টাকা তো আপনাদের মতো লোকেদেরই থাকবে, এত স্মাগলিং, ড্রাগ পাচার, মেয়ে পাচারের টাকা যাবে কোথায়! আমরা হলাম সাধারণ সরকারি কর্মচারী, আপনাদের ঘরে টাকা থাকবে না তো কি আমাদের ঘরে থাকবে? অনেক লেকচার দিয়েছেন, যান এখন ভ্যানে উঠুন, থানায় গিয়ে সব হিসাব কিতাব হবে।

মেঘনা এতক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দঁড়িয়েছিল, তমাল না! সেই তমাল... ওর সেই তমাল... দিল্লিতে পড়তে যাওয়ার নামে সেই কবে যেন হারিয়ে গেল জনারণ্যে, চলমান ছবির মতো সব কথা মনে পড়ে যায়। আর ও টেরও পায় না কখন নোনতা জলে ওর গাল ভিজে গেছে।

তমাল কিন্তু ক্যাজুয়াল, যেন কালকেই দেখা হয়েছিল, আজ আবার দেখা হচ্ছে, শুধু ভুলে যায় ও এই মুহূর্তে একজন আইপিএস অফিসার, এমার্জেন্সি অ্যাকশনে এসেছে, অধীনস্থ লোকেরা ওকে দেখছে,

কি রে, ঠিক আছিস তো? পকেট থেকে রুমাল বের করে মেঘনার মুখ থেকে রক্ত মুছে দিতে দিতে তমাল জিজ্ঞেস করে।

মেঘনা উত্তর করে না। একটা হাসি কান্না মেশানো অভিব্যক্তি ওর মুখে। ও মালাকে খোঁজে।

মিস্টার গুরুং, আপনি এদের সবাইকে নিয়ে মানখিম পুলিশ চৌকিতে চলে যান। এই ম্যাডাম আর সুদীপ্তবাবুর ফার্স্ট এইড আর রেস্টের ব্যবস্থা করবেন। আমি গ্যাংটকের মিস্টার তামাংকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। আসল লোককেই এখনও অ্যারেস্ট করা হল না। সে আবার তলে তলে কী ঘোঁট পাকাচ্ছে কে জানে!

মালা এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছিল। ঘটনার ঘনঘটায় ও হতবাক। এ তো একদম হিন্দি মুভির মতো হল। পুলিশ যে এত তাড়াতাড়ি স্টেপ নেবে, বা আদৌ কোনও স্টেপ নেবে, এটা ওর কল্পনার বাইরে। অন্তত, ওর জীবন ওকে এই শিক্ষাই দিয়েছে। এতক্ষণে ওর মুখ ফোটে,

দিদি, তুমি আমাকে বারবার বলেছিলে তোমার মোবাইলটা খুঁজে বের করতে, আমি তক্কে তক্কে ছিলাম। যেই রোহিত আর সোনাম শর্মার সঙ্গে তোমার ঘরের দিকে গেল, আমি এক ছুটে ওদের ঘরে ঢুকে ওদের ব্যাগপত্র হাটকে দেখি রোহিতের রুকস্যাকে আছে ফোনটা। ওই জন্যই ও সবসময় ওটা আগলে আগলে রাখত। যা হয় হোক, এই ভেবে আমি সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা অন করে দিই, মালার মুখে লাজুক হাসি।

সাবাশ! আমাদের আজকের মিশন সাকসেসফুল হওয়ার আসল ক্রেডিট তোমার।

তমালের প্রশংসায় মালার মুখ লজ্জায় রক্তিম হয়ে ওঠে।

তমাল, এই মেয়েটার নাম মালা, এও আমার মতোই এক ভিক্টিম, বাধ্য হয়ে ওদের দলের সঙ্গে এতদিন ধরে আছে । আমি পরে তোকে সব বলব।

দাঁড়া দাঁড়া, আগে সবকটাকে ধরি, তারপর তোর সব কথা শুনব। এখনও অনেক লিগ্যাল প্রসিডিওর বাকি।

এবার সবকটা গাড়ির মুখ মানখিমের দিকে। গাড়িতে উঠেই সুদীপ্ত ফিসফিস করে মেঘনাকে জিজ্ঞাসা করে,

দিদি যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলি, আপনি কি এই অফিসারকে আগে থেকে চিনতেন?

আমার স্কুলের বন্ধু। তবে ও যে এখানে পোস্টেড, তা জানতাম না। বহুদিন কোনও যোগাযোগ নেই, মেঘনার মুখ থমথমে। ও যেন ঠিক এই জগতে নেই। সব দেখেশুনে সুদীপ্তও আর বেশি ঘাঁটায় না।

**

এদিকে তমালের টেনশন হচ্ছে, নোরবুকে ধরতে না পারলে আজকের অ্যাকশন কমপ্লিট হবে না। কিন্তু, নোরবু কি এত সহজে ধরা দেবে?

নোরবুর প্রাসাদোপম বাড়িটা দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু চারদিক শুনশান, অন্যদিনের মতো দর্শনার্থীদের ভিড় নেই। পুলিশের গাড়ি দেখে দারোয়ান দৌড়ে এসে নিজে থেকেই গেট খুলে দিয়ে সেলাম ঠুকল। কিন্তু ভেতরে ঢোকাই সার, নোরবুর সেক্রেটারি এসে জানায়, স্যার তো ক-দিন ধরে গ্যাংটকে আছেন। জরুরি মিটিং চলছে কেন্দ্রীয় কমিটির। বোঝাই যাচ্ছে সবটা সাজানো ব্যাপার। নোরবু গ্যাংটকে থাকলে ওর পিএ এখানে বসে বসে কি মাছি মারছে! ওরও তো সঙ্গে যাওয়ার কথা। অবশ্য তমাল ঠিক এটাই সন্দেহ করেছিল। নোরবুকে এত সহজে ধরা যাবে না, আগে এই লোকগুলোকে ভালোমতো জেরা করে, সমস্ত তথ্যপ্রমাণ নিয়ে আঁটঘাট বেঁধে তবেই আসতে হবে। এখন প্রাথমিক কাজ হল আচার্যর খুনিদের শাস্তির ব্যবস্থা আর পটগুলো উদ্ধার করা। তমাল রায়, তোমার অত সহজে ছুটি নেই। ভেতরে ভেতরে আরও একগুঁয়ে হয়ে ওঠে তমাল।

১৬

মানখিমের পুলিশ চৌকিতে আজ বিকেলে জরুরি বৈঠক। ঘরে কেবল তমাল, গুরুং, মেঘনা আর সুদীপ্ত।

সবই তো হল, কিন্তু পটগুলো? তমাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেঘনার চোখের দিকে তাকায়, আজ অব্দি আমার প্রেডিকশন কখনও ভুল হয়নি। আই অ্যাম কনফিডেন্ট, তুইই লামার সঙ্গে সাঁট করে ওগুলো কোথাও লুকিয়ে রেখেছিস।

হ্যাঁ, আমিও জানি যে, এবার বলতেই হবে। কিন্তু তুই পটগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুঝতে পারছিস? এগুলোর একটা আলাদা আর্কাইভাল ভ্যালু আছে। এ কারণেই আমি পটগুলোর জন্য আমার জীবন বাজি রেখে লড়েছি। এগুলো উদ্ধার হলে ঠিকঠাক প্রিজার্ভ করার দায়িত্ব কিন্তু সরকারকে নিতে হবে।

সুদীপ্তও মেঘনার কথায় সায় দেয়, সত্যি স্যার, এই ক'দিনে মেঘনাদির ওপর দিয়ে যা গেল, সেটা কেবল আমিই জানি। অন্য কেউ হলে কখন সব কথা উগরে দিত।

এত যে ঘটনা ঘটে গেছে, মেঘনা আবারও বলে, আমি এমনকি সুদীপ্তকেও সব কথা জানাইনি গোপনীয়তার কারণে।

এটা কিন্তু আপনি ঠিক করেননি, একা একা এতটা ঝুঁকি নিলেন! আর আমাকেও আপনি বিশ্বাস করেন না? এটা আমার খুব মনে লেগেছে, সুদীপ্ত বলে।

না সুদীপ্ত, এটা ঠিক বিশ্বাস অবিশ্বাসের ব্যাপার নয়, সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল, যত কম লোক

এই সম্পর্কে জানে ততই মঙ্গল। সেকারণেই আচার্য ছাড়া মঠের আর কাউকেই কাজটাতে ইনভলভ করিনি। আচার্যরও কড়া নির্দেশ ছিল কাউকে কিছু না বলার।

আমি যখন ওই ভিউ পয়েন্টে বসে রোহিতদের কথাবার্তা শুনে ফেলি, তখনই মনে মনে স্থির করে নিই, পটগুলোকে যে করেই হোক এদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। কেন-না এদের হাতে পড়লে ওগুলো আর এদেশে থাকবে না, চোরাপথে বিদেশে পাচার হয়ে যাবে, একরকম তো আকছারই ঘটছে।

এগুলো পরে শুনব, কথা বলে সময় নষ্ট করা যাবে না, জলদি জলদি বলে ফেল কোথায় রেখেছিস পটগুলো, মেঘনার কথা মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে তমাল অর্ডারের ভঙ্গিতে বলে।

পটগুলোর জন্য আমাদের মনাস্ট্রিতে যেতে হবে। ওখানেই লুকানো আছে ওগুলো। আচার্যর ঘরের ভেতর একটা গোপন সুড়ঙ্গ আছে, বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে যায় মেঘনা। সেই কোন ঐতিহাসিক কাল থেকে এই সুড়ঙ্গ একা একা কত ঘটনার সাক্ষি হয়ে রয়েছে, এতযুগ বাদে আবার সেখানে মানুষের পায়ের স্পর্শ লেগেছে, আজও আবার লাগবে, সুড়ঙ্গ কি আবারও আজকের ঘটনার সাক্ষি হয়ে অপেক্ষা করে থাকবে পরবর্তী কোনও যুগের জন্য!

স্যার, সবকিছু তো জেনেই গেলেন, এখন কিছু খেয়ে নিয়ে ওখানে গেলে হত না? সকাল থেকে পেটে তো কারোর দানাপানি পড়েনি, গুরুং হঠাৎ করেই তৎপর হয়ে ওঠে।

ওকে। আপনি তাহলে কিছু খাবার অর্ডার করে দিন, আর দেরি করা যাবে না, এমনিতেই প্রায় সন্ধে হয়ে আসছে। তমালকে অধৈর্য দেখায়।

স্যার, কিছু মাইন্ড করবেন না, পাশেই আমার কোয়ার্টার, আমি এক্ষুনি ওখান থেকে আপনাদের জন্য খাবার আনিয়ে নিচ্ছি, আর আমিও একটু...

বেশিক্ষণ লাগবে না স্যার, এই যাব আর আসব। গুরুং অনুমতির অপেক্ষা না করেই উঠে দাঁড়ায়।

গুরুং বেরিয়ে যেতেই মেঘনা বলে, শোন তমাল এই গুরুং ছিল বলে সব কথা বলতে পারছিলাম না, এদিকে তুই বারবার জিজ্ঞেস করছিস পটের কথা, আর আমি ফাঁপরে পড়ে যাচ্ছি। আসল কথা হল, সরষের মধ্যেই ভূত। আমি সেদিন রোহিতদের সমস্ত কথা শুনে বুঝেছি, মঠের একজন লামাই ওদের পটগুলোর ব্যাপারে সব ইনফর্মেশন দিয়েছে। কিন্তু ওরা লোকটার নাম বলেনি। এখন তোর কাজ হল, ওই লোকটাকে ডিটেক্ট করে অ্যারেস্ট করা। ওর জন্যই লামাজিকে এভাবে বেঘোরে প্রাণ দিতে হল। আমি কিছুতেই সেই কথা ভুলতে পারছি না।

হবে হবে, সব হবে, এখন তো ঘর ফাঁকা, তমাল আর ধৈর্য রাখতে পারছে না, এবার তো বল সবটা, তুই যে এই কেসে সবচেয়ে ইমপর্টেন্ট উইটনেস, এটা বুঝছিস না!

হ্যাঁ বলছি, মেঘনা বলে, তখন তো ভয়ে আমার হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে, জীবনে এই প্রথম এরকম সব ক্রিমিনালদের স্বচক্ষে দেখলাম, স্বচক্ষে বললেও ভুল, তখনও তো দেখিইনি, শুধু ওদের কথাবার্তা শুনেছি, তাও লুকিয়ে লুকিয়ে। যাই হোক আমার তখন একটাই চিন্তা, কী করে পটগুলো এই স্মাগলারদের হাত থেকে বাঁচানো যায়। এতটাই নার্ভাস ফিল করছি যে, আমার মাথাই আর কাজ করছে না। কোনোমতে হোমস্টেতে ফিরে ওয়ালেট আর মোবাইলটা নিয়ে আমি প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে মনাস্ট্রিতে গিয়ে লামাজিকে সব কথা খুলে বললাম। এদিকে উনি দেখি সবকিছু শুনেও নির্বিকার,

কোনও চিন্তা করো না। উপায় আছে, একটাই উপায়, তোমাকে বলছি, কারণ তোমার সাহায্য ছাড়া আমি একা একা কিছুই করতে পারব না, আমার বয়েস হয়ে গেছে, শরীরেও আর আগের মতো জোর নেই। আমার ঘরের খাটের নিচে পাথরের ওপর একটা

ছবি আঁকা আছে, সেই ছবির মধ্যেই আবার লুকিয়ে আছে এক গোপন পথের সূত্র। কিন্তু তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, প্রাণ থাকতে এই কথা কাউকে বলবে না।

আমার স্বভাব তো জানিস, এদিকে আমি টেনশনে পাগল হয়ে যাচ্ছি, তার মধ্যে উনি আবার এইসব হেঁয়ালি শুরু করেছেন। এদিকে ঘড়ির কাঁটা কি ওঁর এইসব ব্যাখ্যার জন্য বসে থাকবে! আমি আর থাকতে না পেরে ওঁকে ছোট্ট করে একটা ধমকই দিয়ে দিলাম। কিন্তু কী সুন্দর স্বভাবের মানুষ এই আচার্য! আমার ওপর একটুও রাগ না করে বললেন,

হেঁয়ালি নয়, আমার ঘরে একটা গুপ্ত সুড়ঙ্গের রাস্তা আছে। আর সেই রাস্তার কথা বলা আছে এই ছবিতে, ঠিক ছবিতে নয়, একটা ধাঁধা আছে, একটা মন্ত্র, আর আছে একটা চাবি, যার কথা আমাদের প্রধান আচার্য ছাড়া আর কেউ জানে না। তাঁর মৃত্যুর আগে তিনি আবার পরবর্তী আচার্যকে বলে দিয়ে যান। মূলমন্ত্র সন্ধ্যাভাষায় লেখা...

আমি তখন ভদ্রতা সভ্যতা সব ভুলে গেছি, ওঁকে সোজা বললাম, লামাজি, মন্ত্র টন্ত্র এখন বাদ দিন, যা বলার সহজ ভাষায় বলুন, নষ্ট করার মতো সময় একেবারেই আমাদের হাতে নেই, যা করার এক্ষুনি করতে হবে। ওরা এই এসে পড়ল বলে, তার আগে পটগুলো না সরাতে পারলে কিন্তু সব শেষ হয়ে যাবে।

আচ্ছা আচ্ছা, আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আগে এই খাটটা সরাতে হবে।

লামার সঙ্গে আমিও হাত লাগালাম, খাটটা কী ভারী ভাবতে পারবি না, আগেকার দিনের কাঠ, তার ওপর লামার বয়েস হয়েছে, ওঁরই বেশি কষ্ট হচ্ছিল। দুজনেই ওই শীতের মধ্যেও দরদরিয়ে ঘামছি। খাটটা সরানোর পর লামা বললেন,

দেখ, আবারও বলছি, এই সুড়ঙ্গের কথা এই মঠের প্রধান অধ্যক্ষ ছাড়া আর কেউ জানেন না, জানতেও পারেন না। তোমাকে অঙ্গীকার করতে হবে যে, এর কথা আর কাউকে বলবে না। তুর্কিদের

আক্রমণের সময় প্রায় সমস্ত মনাস্ট্রিতেই পালিয়ে যাওয়া এবং পুথিপত্র, সম্পদ এসব সরিয়ে ফেলার জন্য এ ধরনের গুপ্তপথ তৈরি করা হয়েছিল। আবার সহজেই যাতে যে কেউ এই পথের সন্ধান পেয়ে না যায় তার জন্যই কিছু সংকেতের সাহায্যে এগুলিকে চিহ্নিত করা থাকত আর এই সংকেত কেবল মঠের অধ্যক্ষরাই জানতেন।

খাটটা সরাতেই দেখি মেঝের ওপর একটা বেশ বড়ো সড় মণিচক্র খোদাই করা। এতদিন লামাজির ঘরে গেছি, খেয়ালই করিনি দেওয়ালের গায়ে একটা লুকোনো সিন্দুক আছে। তুইও অ্যাপারেন্টলি দেখে কিছুই বুঝতে পারবি না। ইনফ্যাক্ট না জানা থাকলে কেউ বুঝবেই না, ওটা একটা সিন্দুক। ওপরে একটা চারচৌকো কাঠের গায়ে অবলোকিতেশ্বরের ছবি আঁকা। সেই ছবিটা স্লাইড করে সরালেই সিন্দুক খুলে যাবে। লামা সেই সিন্দুক খুলে পাথরের তৈরি একটা পদ্মফুল বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, এবার ভালো করে খেয়াল করো, এই মণিচক্রের মাঝখানে যে পদ্মফুল খোদাই করা সেটা আর এই পদ্মটা হুবহু এক। এটাই হল গোপন সুড়ঙ্গের চাবি। মন্ত্রের মধ্যে গুপ্তভাষায় এই কথাগুলোই লেখা আছে। সময় নেই বলে আমি তোমাকে এভাবে বলে দিলাম। এবার তুমি ওই পদ্মের ওপর এই পদ্মটা বসিয়ে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘোরাতে থাকো।

আমি তখন আর ভাবনা-চিন্তা করার মতো অবস্থায় নেই। উনি যা বলছেন, যন্ত্রের মতো তাই করে যাচ্ছি। কিন্তু কী আশ্চর্য! পদ্মটা ওঁর হাত থেকে নিয়ে মণিচক্রের মাঝখানের পদ্মটার ওপর বসাতেই দেখি, একদম খাপে খাপে বসে গেছে। বসল তো বটে, কিন্তু ঘোরাতে গিয়েই যত বিপত্তি। কত চেষ্টা করছি, কিছুতেই আর ঘোরে না।

হচ্ছে না, হচ্ছে না, লামাজি বললেন, বহুদিনের অব্যবহারে শক্ত হয়ে গেছে, জোর লাগাও, আরও আরও জোরে চাপ দাও।

সত্যি সত্যিই প্রাণপণে চেষ্টা করতে করতে একসময় দেখি পদ্মটা ঘুরতে শুরু করেছে। আর আস্তে আস্তে একটা পাল্লার মতো মেঝের পাথরটা সরে যাচ্ছে। আমার তো তখন পুরো গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। কী অদ্ভুত কৌশল, ভাব তুই প্রাচীন স্থপতিবিদ্যা কত উন্নত ছিল! উঁকি দিয়ে দেখি একটা অন্ধকার সুঁড়িপথ। লামার হাতে টর্চ, তিনি আগে আগে নামলেন। আমি পেছন পেছন বাক্স হাতে। নিচে ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে। কত যুগ ধরে অন্ধকার যেন সেই সুড়ঙ্গের ভেতর ঘাপটি মেরে বসে আছে। টর্চের সামান্য আলোয় তা দূর হয় না।

এই সিঁড়ি আরিতার লেকে গিয়ে শেষ হয়েছে, যাতে কেউ এখান দিয়ে পালিয়ে গেলে শত্রুরা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে না পারে, লামা বললেন, সাবধানে এসো, সিঁড়ির ধাপ অনেক পুরোনো, মাঝেমধ্যে ভাঙাচোরা আছে।

এতক্ষণ তো অনেক বড়ো বড়ো কথা বলেছি, কিন্তু ওই সুড়ঙ্গ আর সিঁড়ির হাল দেখে আমার রীতিমতো ভয় ধরে গেছে, এত পুরোনো সিঁড়ি, ভেতরে কেমন একটা চিমসে গন্ধ, যদি ফাঁকফোকরে সাপটাপ থাকে। এদিকে হাত বন্ধ বলে মোবাইলের আলোও জ্বালতে পারছি না। লামার টর্চের আলোয় যেটুকু দেখা যাচ্ছে।

কিছুদূর যাওয়ার পর দেওয়ালের গায়ে একটা জায়গায় লামা আলো ফেললেন, এই দ্যাখো, এখানে কয়েকটা তাক করা আছে।

তাক বলতে পাথরের দেওয়ালের গায়ে কুলুঙ্গির মতো, কিন্তু বড়ো বড়ো জায়গা করা। তারই একটাতে বাক্সটা রেখে কোনোমতে হুড়মুড়িয়ে ওপরে উঠে এসে তবে শান্তি।

বাবাহ, তুই তো একদম ইংলিশ থ্রিলারের হিরোইনের মতো অ্যাকশনে নেমে গিয়েছিলিস, পটগুলার সন্ধান পেয়ে তমালকে বেশ খুশি খুশি দেখায়।

সব কথাই তো বলে দিলাম, এবার তুই ওই লামাকে অ্যারেস্ট করার ব্যবস্থা কর, ওই হল সম্পূর্ণ চক্রান্তের মূল পাণ্ডা।

দাঁড়া দাঁড়া, এত অস্থির হলে চলবে, ধর তক্তা মার পেরেক করে কি আর সরকারি কাজ হয়! অনেক নিয়ম মেনে আমাদের চলতে হয়। আগে এই ক্রিমিনালগুলোকে ভালো করে ইন্টারোগেট করি, তারপর সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে ওকে আর নোরবুকে কবজা করব। তোরা তো এদিকের খবর কিছুই জানিস না, আজ সকালেই নোরবুর লোকজন থানা ঘেরাও করেছিল। এখানে ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট সাংঘাতিক। এই মুহূর্তে যদি একজন লামাকেও অ্যারেস্ট করি তাহলে একটা বড়ো সড় অ্যাজিটেশন তৈরি হবে। আচ্ছা, গুরুং গেল তো গেলই, তোরা বস, আমি এক্ষুনি আসছি।

কিছুক্ষণ বাদেই তমাল আর গুরুং এসে ঘরে ঢোকে, পেছনে একটা লোকের হাতে ট্রে ভর্তি মোমোর প্লেট। খাবারের গন্ধে সকলেরই খিদেটা আনচান করে ওঠে। হাতে হাতে সব খাবার শেষ হয়ে যায় নিমেষেই। কিন্তু তমাল এত গম্ভীর কেন, একটা ভ্রুকুটি লেগে আছে ওর সারা মুখে, যেন এইমাত্র ফেটে পড়বে।

এবার সকলেই জিপে উঠে পড়ে। সন্ধে হয়ে আসছে। হালকা কুয়াশা ছড়িয়ে পড়ছে পাহাড়ে। জিপ ছুটল মনাস্ট্রির দিকে।

কিন্তু মঠে পৌঁছনোর পরেই প্রথম বাধা এল সহকারী আচার্যর কাছ থেকে। আচার্যর অবর্তমানে সেই এখন প্রধান লামা, তার কথাই এখন শেষ কথা।

এই সন্ধেবেলার প্রার্থনার সময় আমি তো আপনাদের মঠে ঢোকার অনুমতি দিতে পারি না। কাল আসুন।

দেখুন, সরকারি কাজে বাধা দিলে ফল ভালো হবে না, তমাল বলে, আপনারা প্রার্থনা সেরে নিন, আমরা ততক্ষণ অপেক্ষা করছি। এটা সিএম-এর অর্ডার, পটগুলোর সন্ধান করতেই হবে।

সিএম-এর নাম করতেই জোঁকের মুখে নুন পড়ল। তা ছাড়া পটগুলোর কথা শুনতেই লামার মুখ চকচক করে ওঠে,

পটগুলোর খোঁজ পাওয়া গেছে!

যান, আপনারা প্রার্থনা সেরে নিন, আমাদের দেরি করাবেন না, তমাল বলে।

দেখলি তো এইসব ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে আমাদের মতো অফিসারেরাও কত অসহায়!

এই লোকগুলোকে আমার জাস্ট সহ্য হচ্ছে না, মেঘনা বলে, ওদের মধ্যেই কারোর জন্য আচার্যর মতো মানুষকে মরতে হল। আর এখন সবাই কেমন সাধু সাজছে। খুব অবাক লাগে, একই প্রফেশনে পুরো বিপরীত চরিত্রের দুটো মানুষ। আর আজকের কথাবার্তা শুনে, আমার তো মনে হচ্ছে এই লোকটাই সব খবরাখবর দিয়েছে। একজন মঠের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রাণ দিলেন, আর ইনি মঠের সম্পত্তি বিকিয়ে দেওয়ার জন্য ওঁত পেতে বসে আছেন। আবার প্রার্থনার অজুহাত দিচ্ছে, বেড়াল তপস্বী কোথাকার।

সব প্রফেশনেই এরকম হয়। তমালের মুখ আরও গম্ভীর, একটু আসছি।

কিছুটা দূরে গিয়ে তমাল মোবাইল বের করে কাকে যেন ফোন করে, ওরা হুঁ-হ্যাঁ ছাড়া বিশেষ কিছু শুনতে পায় না।

একটু বাদেই একজন সাধারণ লামা এসে ওদের ভেতরে ডেকে নিয়ে যায়। তমাল সুদীপ্তকে এই মিশনে আনতে চায়নি, কিন্তু ও নাছোড়বান্দা, আসবেই। এই অ্যাকশনে কিন্তু মেঘনাই লিডার, পরিচিত পথে যেতে যেতে আচার্যর কথা মনে করে ওর বুকের ভেতর হুহু করে ওঠে।

মিস্টার গুরুং আপনি আগে গিয়ে আচার্যর ঘরের দরজাটা খুলে আলোটালোগুলো জ্বালুন।

আমি আগে যাব স্যার! গুরুং-এর কেমন একটা ইতস্তত ভাব।

ইয়েস, ইউ মাস্ট।

না স্যার, বলছিলাম কী ইয়ে, মানে দরজা খোলার জন্য তো আমি আগেই লোক পাঠিয়ে দিয়েছি, গেলেই খোলা পেয়ে যাব, গুরুং মরিয়া হয়ে উঠেছে, কিছুটা যেন একগুঁয়ে, কোনোমতেই আগেভাগে যেতে চাইছে না।

আগেই লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন মানে! আমাকে ইনফর্ম না করেই, এত সাহস কোত্থেকে পাচ্ছেন মিস্টার গুরুং?

না স্যার, এই ম্যাডাম যখন বললেন লামার ঘরেই সুড়ঙ্গ, আমি ভাবলাম কাজটা এগিয়ে রাখি...গুরুং আমতা আমতা করে।

জানেন, এর জন্য আমি আপনাকে সাসপেন্ড করতে পারি! আমাকে ইনফর্ম না করেই এতবড়ো একটা কাজ আপনি করে বসলেন? এর মধ্যে যদি কেউ পটগুলো চুরি করে নেয়? আপনি দায়িত্ব নেবেন? তমালের মুখ রাগে গনগন করছে। রিভলবারের সেফটি ক্যাচ আনলক করে, চলুন! গুরুংকে ধমকে ওঠে তমাল।

না স্যার, লোক আছে পাহারায়, কিচ্ছু হবে না, গুরুং বলে, তা ছাড়া ওই সুড়ঙ্গের রাস্তা এই ম্যাডাম ছাড়া আর কেউ তো জানেই না, চুরি করবে কী করে!

গুরুং যেন আজকে বেশ ডেসপারেট, ওর বশংবদ মূর্তিটা একদম বদলে গিয়েছে, তমাল ভাবে, ওর ব্যবস্থা করতে হবে।

তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। মঠের চাতালে টিমটিমে দুটো হলুদ বালব, সেই অল্প আলোয় ওরা আচার্যর ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

যান, আচার্যর ঘরে গিয়ে আগে লাইট জ্বালুন, আমরা আসছি।

তমালের এই কথায় মেঘনা অবাক হয়ে যায়, লক্ষ্যের এত কাছে এসে তমাল এরকম আলসেমি করছে কেন, ওর নিজের তো মনে হচ্ছে এক্ষুনি দৌড়ে গিয়ে পটগুলো ওই পাতালের অন্ধকার থেকে বের করে আনে। কিন্তু ও দ্রুত পা চালাতে যেতেই, তমাল

পেছন থেকে ওর হাত টেনে ধরে চোখের ইশারায় ওকে ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকতে বলে।

ওরা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠছে, ঠিক তখনই আর্তনাদটা কানে এল। কেউ যেন প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল, গুরুংএর গলা। আর সঙ্গে সঙ্গে তমাল এক ঝটকায় মেঘনাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে পজিশন নিয়ে নিল সিঁড়ির পাঁচিলের আড়ালে। মঠের আশপাশ থেকেও দুপদাপ ভারী বুটের আওয়াজ। একদল পুলিশ যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে, সবার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। তমাল এক লাথিতে লামার ঘরের আধখোলা দরজা হাট করে খুলে দেয়, চৌকাঠে উপুড় হয়ে পড়ে আছে গুরুং, আর ভেতরে এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে শর্মা আর স্বয়ং নোরবু।

হ্যান্ডস আপ বলে চিৎকার করে ওঠে তমাল, কিন্তু তখন আর সেসবের প্রয়োজন নেই, পালানোর আর কোনও সুযোগ নেই দেখে, ওরা এমনিতেই হাত তুলে দিয়েছে। তামাং এসে হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে দেয়। বন্দুকধারী পুলিশেরা চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে।

নোরবু তমালের দিকে তাকিয়ে কাতর স্বরে বলে, প্লিজ মিস্টার রয়, আমাকে এভাবে জনগণের সামনে দিয়ে নিয়ে যাবেন না, আমার ইমেজ একেবারে শেষ হয়ে যাবে।

ইমেজের অ্যায়সি কি ত্যায়সি, এবার ভালোয় ভালোয় সব কথা বলে দিন, নইলে কপালে অশেষ দুঃখ আছে, বলুন এই পটগুলোর খোঁজ পেলেন কীভাবে?

মিস্টার রয়, আপনি কিন্তু ভুল করছেন, একটু সময় পার হতেই নোরবু আবার স্বমূর্তি ধারণ করে, কোনও প্রুফ আছে আপনার কাছে, ওয়ারেন্ট? আপনি আমাকে চেনেন না। নতুন চাকরিতে জয়েন করেছেন তো, তাই এত যোশ দেখাচ্ছেন। আমি এখানে কোনও পটের জন্য আসিনি। হিম্মত আছে, পট চুরির সঙ্গে আমার কোনও যোগসাজশ আপনি প্রমাণ করতে পারবেন? বিনা দোষে আমাকে এভাবে

অ্যারেস্ট করলে আপনার হালত খারাপ করে দেব। আমার নামও নোরবু, আমাকে সিএম থেকে শুরু করে সবাই এক ডাকে চেনে।

পটগুলোর জন্য আসেননি তো কি এই সন্ধে বেলায় লামার ঘরে শোকসভা করতে এসেছিলেন, নাকি এখানেই আপনার কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং চলছে! তমালের গলায় বিদ্রূপ ও রাগ একই সঙ্গে ঝরে পড়ে, রোহিত জেরার মুখে স্বীকার করেছে ওংলিং নামে এক লামার কাছ থেকে পটগুলোর খবর পেয়ে আপনি আর এই শর্মা মিলে ফ্রান্সের এক আর্ট-কালেক্টরের কাছে এগুলো বিক্রির মতলব এঁটেছিলেন। মাঝে থেকে মেঘনা ম্যাডাম এসে পটগুলো সরিয়ে ফেলায় ওঁকে কিডন্যাপ করে কথা বের করার জন্য অকথ্য অত্যাচার করেছেন। আর এই মুহূর্তে তো আমি এবং মিস্টার তামাং সাক্ষী যে, আপনারা গুরুংকে প্রাণঘাতী আঘাত করেছেন। এইসব কথা শোনার পরও কি সিএম আপনাকে দলের নেতা হিসেবে রাখবেন বলে ভেবেছেন?

নোরবুর মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে যায়, এই ঠান্ডাতেও দরদর করে ঘামতে থাকে। মুখে আর কোনও কথা সরে না।

আরও কথা আছে, তমাল গর্জে ওঠে, মিস্টার শর্মা, আপনাকে তো সকাল বেলাতেই অ্যারেস্ট করলাম, এখনও কোর্টেই তোলা হয়নি, বেল ছাড়াই আপনি এই সময় জেলের বাইরে এলেন কী করে? নাকি আপনার টাকায় পোষা কুকুর এই গুরুং আপনাকে চুপচাপ বের করে দিয়েছে, যাতে করে আমরা পটগুলো উদ্ধার করার জন্য এই ঘরে ঢোকার সময় আমাকে এই গুরুং-এর মতো মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে পটগুলো হাতিয়ে নিয়ে গোপন শেলটারে আশ্রয় নিতে পারেন! আমার সকালেই আপনার মুখে গুরুংকে মাসে মাসে টাকা দেওয়ার কথা শুনে সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু আমি কাউকে বুঝতে দিইনি। শুধু মিস্টার তামাংকে বলেছিলাম আরিতার থেকে সামান্য

দূরে গিয়ে ফোর্স নিয়ে অপেক্ষা করতে। নোরবুর বাড়ি গিয়ে যখন ওকে পেলাম না, আমি তখনই আঁচ করেছিলাম যে, পটগুলো নিতে আসার সময় কোনও না কোনও গোলযোগ আপনারা ঘটাবেনই। আর তারপর গুরুং যখন মিটিংএর পর খাবার আনার জন্য বাড়ি যাওয়ার নাম করে গিয়ে অত সময় লাগাচ্ছিল, তখনই আমি বিপদের গন্ধ পাই, ফলে কাউকে না পাঠিয়ে নিজেই ওর বাড়ি গিয়ে আপনাদের ফোনের সমস্ত কথাবার্তা শুনে ফেলি। আর এই কারণেই লামার ঘরে গুরুংকে প্রথমে ঢুকতে বলি। যাক, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা হল, গুরুংও পুলিশ হয়ে অপরাধিদের সঙ্গে হাত মেলানোর শাস্তি পেল। মিস্টার তামাং আপনি প্লিজ এদের ভ্যানে তুলুন। আর হ্যাঁ, এই ওংলিং লামাকেও অ্যারেস্ট করতে ভুলবেন না কিন্তু।

আচার্যর ঘরে এই মুহূর্তে মেঘনা, তমাল আর সুদীপ্ত ছাড়া কেউ নেই। বাইরে পুলিশ ব্যারিকেড করে রেখেছে, যাতে আর কেউ না ঢুকতে পারে। মেঘনা ওদের খাটটা সরানোর কাজে হাত লাগাতে বলে। খাটটা সরাতেই সেই মণিচক্র দেখা যায়, মেঘনা সিন্দুকের থেকে পদ্মটা বের করে মণিচক্রের ওপর বসিয়ে ঘোরাতেই, তমাল আর সুদীপ্তকে বিস্মিত করে দিয়ে প্রাচীন কারিগরির কৌশলে সুড়ঙ্গের পথ খুলে যায়।

মাই গড! তমাল চমকিত, ভাবা যায়, সেই কোন যুগে বসে এরা এরকম কাজ করে গেছে!

সুদীপ্তর মুখ সেই যে হাঁ হয়েছে, আর বন্ধই হচ্ছে না। এবার সিঁড়ি দিয়ে নামার পালা।

সাবধান! অনেক ভাঙাচোরা আছে, মেঘনা বলে, আমার পিছন পিছন আয়।

অবশেষে পটভর্তি বাক্সটা নিয়ে ওপরে উঠে এল ওরা। তিনজনেই প্রচণ্ড ক্লান্ত, কিন্তু পরিতৃপ্তির ছাপ

ঘামতেলের মতো লেগে আছে ওদের মুখে। এবার থানায় ফেরার পালা।

আমার খুব অবাক লাগছে, মেঘনা বলে, ওংলিং এই পটগুলোর খবর জানলই বা কী করে, আর জানলই যদি তো সে খবর একেবারে চোরাচালানকারিদের দিয়ে দিল! লোকটার কাছে আমি ভেষজ রং তৈরি করা শিখছিলাম, কত পড়াশুনো মানুষটার। একই লোকের মধ্যে কীরকম ডুয়াল পার্সোনালিটি! অবশ্য মাঝেমাঝে কথা বলতে বলতে টের পেতাম, ওর মধ্যে একটা ক্ষোভ আছে। প্রায়ই বলত, ও নাকি ওর যোগ্য মর্যাদা পায় না এই মঠে।

ছাড় তো। তোর সেই নীতিবাগিশ স্বভাব আর গেল না। কাজের কথা শোন, তোরা কিন্তু আজকের রাতটা আমার বাংলোতেই থাকবি। তারপর কাল অফিসিয়াল কাজকর্ম সারা হলে একবারে আমার গাড়ি তোদের শিলিগুড়ি পৌঁছে দেবে। আর ভালো কথা, কেস কোর্টে গেলে কিন্তু উইটনেস দিতে আসতে হবে। তমাল মেঘনার দিকে তাকিয়ে আলতো করে হাসে।

~

পুনশ্চ

গল্প এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত, কিন্তু গল্প তো গল্প-ই, সে কেবল বয়ে যেতে চায়। আর জলের ওপর যেমন মানুষের কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে না সেরকম এই কাহিনি আর আমার আয়ত্তে থাকল না। কলকাতা থেকে শুরু করে মানখিমে নিয়ে শেষ করে দেব, এরকমটা আমি ভাবলে কী হবে, গল্প এখন রংগলি হয়ে গ্যাংটক যেতে চাইছে। সুতরাং আমরাও এখন গল্পের পেছন পেছন হাঁটা দিই।

গ্যাংটকে তমালের বাংলোর ড্রইংরুমে এবার আমরা পৌঁছে যাচ্ছি। মেঘনা, সুদীপ্ত ও তমাল বসে, সকলের হাতেই ধোঁয়া-ওঠা কফির পেয়ালা। টুকটাক কথা হচ্ছে। তিনজনেই খুব ক্লান্ত। সারাদিনের ধকলের ছাপ লেগে আছে সকলের চোখে মুখে। সুদীপ্ত কুশলের কোয়ার্টারে থেকে যেতে চেয়েছিল, তমাল কোনও কথাই শোনেনি, জোর করে ধরে এনেছে। সুদীপ্তকে আজ তমালের দেবদূতের মতো মনে হচ্ছে। ও যদি মেঘনাকে পটগুলোর ব্যাপারে না জানাত, বরং বলা ভালো পটগুলো নিয়ে এতসব কান্ডকারখানা না ঘটলে, মেঘনার সঙ্গে এ জন্মে হয়তো আর দেখাই হত না।

চল, তোদের ঘর দেখিয়ে দিই। অন্য কোনও অতিথি হলে তমাল এটা করে না। এসব কাজের লোকেদের দায়িত্ব। কিন্তু আজ স্বয়ং মেঘনা এই প্রথম এল ওর বাংলোতে, তার আপ্যায়ন একটু অন্যরকম্ না হলে চলে! কাজের লোকেদের অবাক করে দিয়ে তাই দোর্দণ্ডপ্রতাপ এসপি সাহেব অতিথিদের ঘরে পৌঁছে দিতে গেলেন। সুদীপ্ত এরকম ঘরবাড়িতে কখনও থাকেনি, ওর একটু লজ্জা লজ্জা করছিল। কিন্তু তমালের আন্তরিকতায় ওর সমস্ত সংকোচ কেটে

যায়। মেঘনাকে ঘর দেখিয়ে দিয়ে তমাল একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে, ওর মুখে মিটিমিটি হাসি,

যা, আগে স্নান করে ফ্রেশ হয়ে নে, কতদিন স্নান করিসনি নোংরা ভূত কোথাকারের।

মেঘনা মুখ ভেংচায়, হুঁ আমি নোংরা, আর তুই, তুই তো খাওয়ার আগে হাতটাও ধুলি না। আমি কিন্তু জীবনেও ভাবিনি এভাবে তোর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে। আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। নিজেকে চিমটি কেটে দেখতে ইচ্ছে করছে। ঘুমের ওষুধের খোঁয়াড়ি সত্যিই কেটেছে তো, স্বপ্ন দেখছি না তো রে!

এই তমাল রায় থাকতে তোকে আর কেউ আটকে রাখতে পারবে না।

হুঁ, সেইজন্যই তো পালিয়ে গিয়েছিলি দিল্লিতে, মেঘনার মুখ আবার ভার হয়ে আসে।

তুই বিশ্বাস কর, আমি ইচ্ছে করে কিছু করিনি। ভেবেছিলাম দিল্লি থেকে ফিরেই সবার আগে তোর সঙ্গে দেখা করব। তিন মাস বাদে ছুটিতে বাড়ি এসে তোর অনেক খোঁজ করেছি, কিশোর বলল তুই শান্তিনিকেতনে পড়তে গেছিস। কিন্তু কোন ডিপার্টমেন্ট, কী নিয়ে পড়ছিস, সেসব কিছুই বলতে পারল না। সেই অবস্থায় ওখানে গিয়ে তোকে কীভাবে খুঁজে বের করব! শান্তিনিকেতন তো আর একটুখানি কোনও জায়গা না। সেই যুগে মোবাইল টোবাইলও ছিল না, আমি তাও তোদের বাড়ির ল্যান্ডলাইনে অনেকবার ফোন করার চেষ্টা করেছি। নো রিপ্লাই হয়ে গেছে। পরে শুনেছি তোর বাবা ট্রান্সফার হয়ে গেছেন, কোথায়, তাও কেউ বলতে পারেনি।

আসলে তুই ঠিক করে খুঁজিসইনি, মেঘনা গভীর অভিমানে বলে, দিল্লি থেকেও কি একবারের জন্যও ফোন করেছিলি?

না, আমি মানছি, সেটা আমার অন্যায় হয়েছে, তমালের গলায় স্পষ্ট স্বীকারোক্তি, আসলে কলেজের পড়া, কম্পিটিটিভ একজামের কোচিং, সবকিছু নিয়ে টোটালি ঘেঁটে গিয়েছিলাম। তার ওপর সেই প্রথম

অত বড়ো সিটিতে, ওরকম নামকরা কলেজে গিয়ে আমি একটা নতুন রকম জার্নির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম।

তাই এই সাধারণ মেয়েটাকে মনে রাখার প্রয়োজন বোধ করিসনি। ঠিক আছে। তুই আজ আমার জন্য যা করলি তার জন্য থ্যাংকস। কাল তো চলেই যাচ্ছি, তুই তোর ভিআইপির জীবন নিয়ে থাক।

এভাবে বলিস না মেঘনা, তুইও কম কিছু নোস, এই কদিনে আমি তোর ব্যাপারে অনেক খোঁজখবর নিয়েছি। যা, ফ্রেশ হয়ে নে, ওরা ডিনার রেডি করে ফেলবে, এখন তোর মাথা গরম হয়ে আছে, বেশি করে জল ঢাল, তমাল পরিবেশটা হালকা করার চেষ্টা করে, আমিও ঝট করে একটা শাওয়ার নিয়ে আসছি।

তমাল চলে যেতে মেঘনা দরজা বন্ধ করে দেয়। একটু একা থাকা এই মুহূর্তে ওর ভীষণ প্রয়োজন। তমালের লোকেরা ঘরে ওর স্যুটকেস রেখে গেছে। এই জামাকাপড়গুলো চিরদিনের মতো ফেলে দিতে হবে। পোশাক খুলতে খুলতে ভেতরে ভেতরে শিউরে ওঠে মেঘনা। সমস্ত শরীরে ওই শর্মার নোংরা হাতের দাগ লেগে আছে। কী এক আক্রোশে জামাকাপড়গুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে থাকে। ড্রেসিংটেবলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে নিজেই আঁতকে ওঠে মেঘনা। মাথার চুল উলোঝুলো, চোখের তলায় গাঢ় কালি, গালে কালশিটের দাগ, পুরো দেহ নখের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত। যেন শুধু পাহাড়েই নয়, ধস নেমেছে ওর সমস্ত শরীর জুড়ে। একটা রাস্তার পাগলি ছাড়া তাকে আর অন্য কিছু মনে হচ্ছে না। স্নান করলেই কি সব কিছু ধুয়ে মুছে যাবে! সব দাগ কি আর সাবান ঘষে ঘষে তুলে ফেলা যায়! বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার খুলে দিয়ে মেঘনা ভাবে। জীবনের আয়নায় লেগে যাওয়া আঁচড়গুলো অবিকৃত অবস্থাতেই থেকে যায়। হয়তো সময়, হয়তো কী, সময়ের ধুলোই একমাত্র পারে এই দাগের ওপর হালকা প্রলেপ দিতে। কতক্ষণ শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল, ওর কোনও

হুঁশ নেই, চটকা ভাঙল দরজা নক করার শব্দে। তাড়াতাড়ি টাওয়েল জড়িয়ে বাইরে এসে, দ্রুত হাতে হাউসকোটটা গলিয়ে দরজা খোলে, ম্যাডাম, খানা লাগা দিয়া, সাব আপকো বুলা রহা হ্যাঁয়, একজন পরিচারক দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে।

মেঘনা মাথা নেড়ে ওর কথার জবাব দিয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে মনে হয়, খুব ভাগ্য যে তমাল সময়মতো এসে পড়েছিল, নইলে কী হত ভাবলেই আতঙ্কে ওর হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায়। তবে, মালা যদি না থাকত তাহলে তমাল কেন, স্বয়ং ভগবানেরও সাধ্যি ছিল না যে ওকে বাঁচায়। মালার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মেঘনার চোখে জল এসে যায়। আজ কেন জানি বারবার কান্না পাচ্ছে। আবেগটাকে গিলে ফেলতে মেঘনা ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খায়। সবাই অপেক্ষা করছে, তাড়াতাড়ি তৈরি হতে হবে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে প্রত্যেকেই বোঝে চোখ ভেঙে ঘুম আসছে, আজ আর গল্প করার মতো অবস্থায় কেউই নেই।

কিন্তু ঘুম কি অত সহজে আসে! তমাল অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করে উঠে পড়ে। একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরের লাগোয়া ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ায়। মাথার ভেতর কেমন যেন কুরকুর কুরকুর করছে। তমালকে অবাক করে দিয়ে বহুযুগ বাদে আজ আবার ঘাসফড়িং!

কি গো খুশি?

আবার! তুই আবার ঠিক সময় বুঝে জ্বালাতে এসেছিস?

বলো না, খুশি?

বলব না, যাহ।

তোমার হরিয়াল পাখি আবার তোমার দাঁড়ে এসে বসেছে, তুমি খুশি হওনি?

তুই কী করে সব বুঝে যাস বল তো! আমি কিন্তু ভাবতেই পারিনি আবার কোনোদিন দেখা হবে।

হুঁহুঁ, আমি সব বুঝি। এই যে তুমি ঘুমোতে পারছ না, তোমার ভেতর সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর ঢেউ, তোমার ভেতর রোদ্দুর খেলা করছে, আমি সব বুঝি।

ছাই বুঝিস। আমি কি জানি ও এখনও আগের মতো আমাকে চায় কি না?

তুমি একটা হস্তিমূর্খ। যদি নাই চায়, তবে এত অভিমান দেখায়!

ওটা তো রাগ। আমি ওভাবে চলে গিয়েছিলাম তাই রাগ দেখাচ্ছে।

তুমি সত্যিই বদলে গেছ। কোনটা রাগ আর কোনটা অভিমান, তাও বুঝতে পারছ না।

হ্যাঁ রে ফড়িং, আমি বদলে গেছি, এই প্রফেশন আমাকে প্লায়ার দিয়ে বাঁকিয়ে চুরিয়ে নিজের মতো করে নিয়েছে।

ঘোড়াড্ডিম। বদলে গেছ না ছাই। একবার নিজের বুকে হাত রেখে দেখ তো, কেমন ছলাত ছলাত শব্দ পাবে, নৌকা এসে দাঁড়িয়েছে তোমার উঠোনে, তুমি দাঁড় বাইবে না!

"পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ"! ভালো মনে করিয়েছিস কিন্তু।

জলজ গুল্মের ভারে ভরে আছে সমস্ত শরীর
আমার অতীত নেই, ভবিষ্যৎও নেই কোনোখানে

শঙ্খ ঘোষের কবিতার লাইন, জানিস ফড়িং? আমার তো এখন এই অবস্থা। কোনদিন যেন নিজেই এক জলজ শ্যাওলা হয়ে গেছি!

বড্ড ভাবের কথা বল তুমি, আমি অতশত বুঝি না বাপু। তোমার সামনে রং তুলি সব তৈরিই আছে, ক্যানভাস নিজে এসে দাঁড়িয়েছে ইজেলের কাঠে, তুমি ছবি আঁকবে না!

জানি না রে ফড়িং আমি আর পারব কিনা!

আলবাত পারবে। শুধু আগুনটা ঠিকমতো জ্বালাও, দেখো কাঠ যেন ভিজে না থাকে।

আমার সেই চকমকি পাথরটাই যে হারিয়ে গেছে, আমি একটা লাইমস্টোনের মতো ভঙ্গুর, একা দাঁড়িয়ে আছি। তুই কিচ্ছু বুঝিস না।

আমি কিছুই বুঝি না, আর তুমি একেবারে সবজান্তা গুরুঠাকুর! নিজের বুকে হাত রেখে দেখ তো, গুবগুবিটা কেমন বোল তুলেছে, তুমিই শুধু টের পাচ্ছ না। কান থাকতে হয় গো, কান থাকতে হয়। তবেই না জীবন এসে তোমার হাতের তালুর মধ্যে ধরা দেবে।

সে কথাই তো আমিও বলছি। পচে যাওয়া দড়িতে কি আর নৌকো বাঁধা যায়, স্রোত এসে কখন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তার কোনও ভরসা আছে!

কে বলেছে তোমায় এসব কথা? চোর ধরে ধরে তোমার মাথাটাই পেগলে গেছে।

এই একদম বাজে কথা বলবি না...

ঈশ, আমি বললে বাজে কথা আর তুমি বললেই আনকোরা সত্যি! ডুব দাও গো গোঁসাই, তোমার দোতরায় আজ স্বয়ং সুর নিজে এসে বসেছেন্, তাকে এমন হেলাফেলা করতে নেই। হাত বাড়িয়ে একবার ছুঁয়ে দাও, দেখবে এই জোনাকির গাছ তোমাকে কেমন ভিজিয়ে দেয়!

তমাল উত্তর দিতে গিয়ে দেখে ফড়িং হুস করে উড়ে কোথায় যেন চলে যায়। হাত বাড়িয়েও তাকে আর ধরা যায় না। শুধু দেখতে পায় উড়তে উড়তে উড়তে, ফড়িং যেন আর ঘাসফড়িং নেই, সে তখন একটা বিরাট সবুজ জ্বলজ্বলে মাঠ। গোটা আকাশটাই যেন নেমে এসেছে তমালের দোরগোড়ায়, তমাল কি ভাসিয়ে দেবে তার জাহাজ!

~~

তথ্যসূত্র

১। দ্য রাজবংশীস অফ নর্থবেঙ্গল - ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল।

২। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজা-পার্বণ - ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায় (গবেষণা পত্র)।

৩। প্রাচীন উত্তরবঙ্গ ও মাশানদেবতা - ডঃ দীপক কুমার রায়।

https://bengali.koulal.com/pracin-uttorbongo-o-mashan-debota/

৪। প্রাচীন গমীরা নাচ ও মাশানপুজো - ডঃ দীপক কুমার রায়।

৫। লোকায়ত দর্শন - দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

৬। নীহাররঞ্জন রায় - বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব।

৭। বাংলার তন্ত্র - পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

৮। বৌদ্ধ তন্ত্র-০৬ : বৌদ্ধ-তন্ত্রের ক্রমবিকাশ - রণদীপম বসু।

https://horoppa.wordpress.com/2017/10/29/tantric-buddhism-6-evolution-of-tantras/

৯। www.anandabazar.com